মাসিক

জীবনবাতি

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ ◻ মে-জুন ২০১৮

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অনুসরণীয় ও অনুশীলনীয় নির্দেশিকা

উসুলে সাব'আ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

ক ফানা-এ-ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ

১ ফানা আনিল খাল্‌ক — মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট উপকারের কামনা বা প্রত্যাশা না করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া।
ফলে : নিজ শক্তি সামর্থে আস্থা জন্মে।

২ ফানা আনিল হাওয়া — যা না হলে চলে সেই ধরনের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা।
ফলে : জীবনযাত্রা, সহজ, স্বাভাবিক ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

৩ ফানা আনিল এরাদা — ব্যক্তির নিজ ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর মর্জির অনুকূলে পরিচালিত করার মনোবল সৃষ্টি করা।
ফলে : ধৈর্য-সবর ও সহনশীলতার গুণ অর্জিত হয়।

খ মউতে আরবা'আ বা চতুর্বিধ মৃত্যু

৪ মউতে আবয়্যাজ [সাদা মৃত্যু] — সংযম সাধনায় মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা আনয়নে সচেষ্ট হওয়া।
ফলে : মুমিন বান্দা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৫ মউতে আসওয়াদ [কালো মৃত্যু] — পরদোষ পরিহারে এবং নিজদোষ ধ্যানে আত্মশুদ্ধ হতে সচেষ্ট হওয়া।
ফলে : আত্মসংশোধন অর্জন ও শোকরিয়া আদায়ের মনোবল হাসিল হয়।

৬ মউতে আহমর [লাল মৃত্যু] — জাগতিক লোভ-লালসা, কামভাবকে সুনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।
ফলে : চরিত্রে আদলে মোতলক বা বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৭ মউতে আখজার [সবুজ মৃত্যু] — নির্বিলাস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে সচেষ্ট হওয়া।
ফলে : মানব মনে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন বাসনা অবশিষ্ট থাকে না।

মাসিক জীবনবাতি

জ্যৈষ্ঠ-১৪২৫ বাংলা
মে-জুন ২০১৮
শাবান-রমজান- ১৪৩৯ হিজরী

মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা

জীবনবাতি পরিচালনা পরিষদের
প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক
সৈয়দ সহিদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম জামী

বিভাগীয় সম্পাদক
মাওলানা আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ মুজিবুল হক
সৈয়দ তানজীদ হোসাইন

প্রোডাকশন ও বিজ্ঞাপন তত্ত্বাবধায়ক
টিপু বড়ুয়া

সার্কুলেশন তত্ত্বাবধায়ক
রুমি সুলতান

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে
জীবনবাতি প্রকাশনা পরিষদ

জীবনবাতি প্রকাশনা পরিষদের কার্যালয়
কাদের হাইটস ইলেকট্রিক মার্কেট (২য় তলা)
১৯ জে.সি. গুহ রোড, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
এ.এম. প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ও
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল (আমগাছতল)
মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি
চট্টগ্রাম থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন : ০১৮৪০-৭০৮০২৪
e-mail : jibonbati149@gmail.com

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা।

- সম্পাদকীয় ৩
- কোরআনের আলো ৪
  ☞ জীবনবাতি ডেস্ক
- হাদীসের আলো ৭
  ☞ জীবনবাতি ডেস্ক
- পবিত্র রমজানের গুরুত্ব ও ফযিলত ৯
  ☞ শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আখতার হোছাইন
- যাকাতের গুরুত্ব, যাকাতযোগ্য সম্পদ এবং দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বন্টন-নীতির ভূমিকা ১৫
  ☞ ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
- গজলের অন্তরালে মাইজভাণ্ডারী শরাফত (২) ১৮
  ☞ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আলকাদেরী
- মাহে রমজান : কোরআন নাজিল, তাক্বওয়া অর্জন জিহাদ ও বিজয়ের মাস ২৪
  ☞ মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
- শবে কৃদর : মর্যাদা বৃদ্ধির রাত ২৯
  ☞ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী
- ঈদ : ইবাদত ও আনন্দের, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ৩৩
  ☞ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল
- তৃতীয় নয়ন ৩৬
- হারানো মানিক ৪৯
- শব্দভাণ্ডার কুপন ৪৭
- কুইজ প্রতিযোগিতা কুপন ৪৮

মাসিক জীবনবাতি

প্রকাশ সময়

প্রতি বাংলা মাসের ১০ তারিখে

সম্পাদনা নীতিমালা

ধর্মীয়, অধ্যাত্ম ও সামাজিক নৈতিকতায় মাইজভাণ্ডারী দর্শন ভিত্তিক উদার ও নিরপেক্ষ

বার্ষিক গ্রাহক তালিকাভূক্তি

বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাসকারীর জন্য ৩০০/- (তিনশত) টাকা। সার্কভূক্ত দেশসমূহে ১২ মার্কিন ডলার, এশিয়ার অপরাপর দেশসমূহে ২০ মার্কিন ডলার এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসকারীদের জন্য ৩০ মার্কিন ডলার। কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম মহানগর অফিসে নগদ/বিকাশ/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে 'মাসিক জীবনবাতি' এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

বিক্রয় এজেন্ট

৫০ কপির নিচে কমিশনে এজেন্সি দেয়া হয় না।

২০০ কপি পর্যন্ত ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এজেন্সি কমিশন তদউর্ধে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) এজেন্সি কমিশন দেয়া হয়।

বিজ্ঞাপন মূল্য তালিকা

১/৮ পৃষ্ঠা	১/৪ পৃষ্ঠা	অর্ধ পৃষ্ঠা	পূর্ণ পৃষ্ঠা	
			সাদা কালো	রঙিন
টাকা ৮০০/-	টাকা ১৫০০/-	টাকা ২৮০০/-	টাকা ৫০০০/-	টাকা ৮০০০/-

জন্মতিথি সর্বোচ্চ ২০টি শব্দে শুভেচ্ছা/বার্ষিকীর আহবান ২০০ টাকায় প্রকাশ করতে পারবেন। অতিরিক্ত প্রতি শব্দ ১০ টাকা হারে প্রযোজ্য।

যোগাযোগ ঠিকানা

আমের হাইটস ইলেকট্রিক মার্কেট (২য় তলা), রুম নং-৫৭
১৯ কে.সি. দে রোড, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০১৮১৮-১১৯৮১১

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল (আমগাছতল)
মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

পাঠক ফোরাম প্রতিষ্ঠার নিয়ম বিধান

১. প্রতিটি পাঠক ফোরাম ইউনিটে ন্যূনতম সদস্য ১১ (এগার) জন হতে হবে। একজন সদস্য তত্ত্বাবধায়ক ও বাকী সদস্যবৃন্দ সহযোগী সদস্য হিসাবে থাকবেন।

২. তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সকল যোগাযোগ, জীবনবাতি গ্রহণ, বিতরণ, মূল্য আদায়, পরিশোধ ও পরবর্তী সংখ্যার চাহিদা জ্ঞাপনসহ ইউনিটের সকল কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩. আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর যে কোন দায়রা ও শাখায় মাসিক জীবনবাতি পাঠক ফোরামের 'শাখা ইউনিট' স্বদেশ বা 'প্রবাসে' এলাকা সমূহে অন্তর্ভূক্তিতে কমপক্ষে ১১ জন বা ততোধিক পাঠক/গ্রাহকের মাসিক জীবনবাতি পাঠক ফোরামের 'আঞ্চলিক ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

৪. জীবনবাতি পাঠক ফোরামের (ক) শাখা ইউনিট বা (খ) আঞ্চলিক ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠক ফোরাম ইউনিট প্রতিষ্ঠার নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণ করে জীবনবাতির কেন্দ্রীয় বা নগর কার্যালয়ে প্রেরণ বা জমা করতে হবে।

৫. নগদ/বিকাশ যোগে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ২৫% কমিশনে সংশ্লিষ্ট পাঠক ফোরাম ইউনিটের তত্ত্বাবধায়কের নামে প্রতিমাসে মাসিক জীবনবাতি প্রেরণ করা হবে।

৬. প্রতি বাংলাবর্ষের ভিত্তিতে বৈশাখ-চৈত্র সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য সংগ্রহকারী ইউনিটকে 'শ্রেষ্ঠ পাঠক ফোরাম ইউনিট' ঘোষণা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ককে সংগঠনের বর্ধিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে।

৭. পাঠক সচেতনতার জন্য সকল পাঠক ফোরাম ইউনিট সময়ে সময়ে ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় ভাবে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বাৎসরিক ভিত্তিতে আলোচনা পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে জীবনবাতি পাঠক ফোরামের কার্যক্রম পরিচালনার মূল্যায়ন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করা হবে।

জীবনবাতি পাঠক ফোরামের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- জীবনবাতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ ও উসুল প্রচারে সহায়তা করা।
- নতুন নতুন পাঠক/গ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির নিকট মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সঠিক পরিচিতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা।
- তরিকত, তাসাউফ ও মাইজভাণ্ডারী তরিকা পর্যালোচনা এবং নবীন লেখকদের রচনা জীবনবাতিতে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করা।
- মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ও গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী বিষয়ে অপ্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ ও জীবনবাতির মাধ্যমে প্রচারে সহায়তা করা।
- বিভিন্ন মেয়াদে আলোচনা/মত বিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে এলাকার সর্বস্তরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে তথ্য বিনিময় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

আপনার এলাকায় একটি পাঠক ফোরাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিন।

জীবনবাতির কলমে

ইসলামী বিশ্বে মাহে রমজানে সিয়াম সাধনায় আত্মনিবেদনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পুরো একমাসব্যাপী পবিত্রতা, সংযম ও উদারতা অনুশীলনের এই ধর্মীয় বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে ধারণ করতে সকলের সচেতনতা সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। একমাসের ধারাবাহিকতাকে সারা বছর এবং ক্রমান্বয়ে সারাজীবনের চলার পথে সংযম সাধনার শিক্ষায় নিয়োজিত থাকার প্রশিক্ষণের এই পন্থাকে অবলম্বনের যে তাগিদ পবিত্র কোরআনে প্রদান করা হয়েছে আমাদেরকে সেই নির্দেশনায় পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় নিবেদিত হতে হবে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিধানসমূহের আদর্শিক চেতনাকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করে শুধুমাত্র উৎসব ও আয়োজন সর্বস্ব ধর্মচর্চার প্রদর্শনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের নীতি নৈতিকতার সুসংগঠনে, কৃত্রিমতা ও কপটতার আগ্রাসন তাকে সহজ ও সরল পথ বিচ্যুত করে নানা ধরনের অন্যায্য ও অননুমোদিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। ফলে মানবগোষ্ঠির জন্য মহান আল্লাহপাকের পক্ষ হতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্প্রদানে 'আশরাফুল মখলুকাত' হিসাবে অনন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিজেকে উন্নীতকরণের অবকাশে আমাদের জন্য সুদূর পরাহত করে তোলে। মূলত এই ধরনের বিপর্যস্ত অবস্থার মোকাবিলা করে নিজেকে সুরক্ষার অবকাশে মহান আল্লাহর প্রতি শোকরগুজারী আদায়ের তাগিদ এবং শিক্ষা সম্প্রসারের লক্ষ্যে নবী, রসুল, অলী-কামেল হক্কানী পীর-বুজুর্গ এবং আলেমেদ্বীনদেরকে হেদায়তের দায়িত্ব অর্পণ করে প্রেরণ করেছেন যুগে যুগে কালে কালে। সরকারে দো'আলম নূরে মোজাচ্ছম হযরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) ধর্মীয় বিধান সমূহ পালনের মাধ্যমে মানব চরিত্রকে উন্নততর অবস্থানে উন্নীত করার জন্য আবির্ভূত হয়ে মানবের আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অবারিত করুণাধারার অব্যাহত প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে সেই মহান অনুদানের স্মরণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে রহমতুল্লিল আলামীন (দ.) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সামর্থ অর্জন করতে হবে। মাহে রমজান আমাদেরকে সেই কৃতজ্ঞতায় নিজেদেরকে যুক্ত করে এবং চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা অর্জনে কার্যকর সহায়তা প্রদানের সামর্থ সংরক্ষণ করে নিঃসন্দেহে।

রহমতুল্লিল আলামীন (দ.) এর বেলায়তী ধারায় আহমদিউল মশরবে 'গাউসুলআজম এখতেতামিয়া' মওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্যতম অনুশীলনীয় কর্মপন্থা 'উসুলে সাবআ' বা সপ্তপদ্ধতির মাধ্যমে মূলত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পন্থায় হুজুর পুরনূর (দ.) এর নির্দেশিত পথে ও মতের অনুসরণে শুদ্ধতম মানব তথা ইনসানে কামেলের গুণাবলী হাসিলের সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বনের কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। চার ধরনের বিনাশের অনুশীলন প্রক্রিয়ায় 'মউতে আবয়াজ' বা সাদা মৃত্যুর গুণাবলী অর্জনের লক্ষ্যে সিয়াম সাধনায় ধর্মীয় বিধান সমূহকে প্রতিপালনের অব্যাহত তাগিদ দেয়া হয়েছে মাইজভাণ্ডারী তরিকায়। মাহে রমজানে সংযম সাধনার অনুশীলন তো বটেই আগত ভক্তদের প্রতি 'আইয়্যামে বেজের রোযা' রাখার তাগিদও গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। 'আমি বার মাস রোযা রাখি তুমিও রোযা রাখিও'- নির্দেশনা প্রদানপূর্বক আগত ভক্তদেরকে অপরের প্ররোচনায় প্রভাবিত না হয়ে সংযমের সাধনায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তিনি অব্যাহত তাগিদ দিয়েছেন। 'আমার ছেলেরা বার মাস রোযা রাখে'- বলে প্রকৃত 'মাইজভাণ্ডারী' হওয়ার জন্য যে চারিত্রিক সীমারেখা গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী নির্ধারণ করেছেন তাও পরিপূর্ণ সংযম, পবিত্রতা ও উদারতার অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্রকে উন্নততর করার জন্য মূলত সরকারে দো'আলম (দ.) এর সূচিত কর্মপন্থারই অব্যাহত বাস্তবায়নের মৌলিক নির্দেশনা। সুতরাং আদর্শের ভিত্তিতে কারো পক্ষে 'মাইজভাণ্ডারী' পরিচয় ধারণ করতে হলে তাকে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশনামূলক নীতিমালার অনুসারী ও অনুশীলনকারী হতে হবে অনিবার্যভাবে। মাহে রমজান প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী তরিকত ও দর্শন সংশ্লিষ্টদের জন্য ধর্মীয় বিধান সমূহের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হাসিলের এক অবারিত সুযোগকে উন্মোচিত করে চলেছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রমজানের মূল উদ্দেশ্য: নফস বা মানবসত্তার পাপকে বিদগ্ধ করে পরিশুদ্ধতা অর্জনের সামর্থে বলীয়ান করুন। এই মহান দরবারে পাকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় খলিফায়ে আজম-এ-গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য হযরত বাবাভাণ্ডারী কেবলার অনুসৃত ও অনুশীলিত আদর্শে আমরা যদি নিজেদেরকে বলীয়ান ও সামর্থবান হিসাবে গড়তে পারি বস্তুত সেই অর্জনই হবে এই মহান অলি-এ-কামেল এর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নিবেদন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক, সহজ ও সরলপথে কায়েম ও দায়েম থাকার তওফিক দা'ন করুন।

কোরআনের আলো

নিয়মিত কলাম

জীবনবাতি ডেস্ক

بسم الله الرحمن الرحيم

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم. (سورة البقرة: ١١٤)

তরজমা : যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলোর বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে মসজিদ সমূহে প্রবেশ তাদের জন্য সঙ্গত ছিল না। তাদের জন্য পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে মহাশাস্তি রয়েছে। [সুরা বাকারা, আয়াত-১১৪]

শানে নুযুল : উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় তাফসীর শাস্ত্রবিশারদগণ উল্লেখ করেছেন- আলোচ্য আয়াত বায়তুল মুকাদ্দাস এর অবমাননা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম পূর্বকালে ইহুদিরা সায়্যিদুনা হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে হত্যা করলে খৃস্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইয়াহুদিদের উপর আক্রমণ চালায়। হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষতবিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জনমানবহীন বিরান ভূমিতে পরিণত করে দেয়। এতে ইয়াহুদীগণের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

আমিরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু এর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁর নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অধীনে ছিল। অতপর বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধ শতাধিককাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খৃস্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন।

[তাফসীরে রুহুল বয়ান, খাযাইনুল ইরফান, নঈমী শরীফ]

কোন কোন তাফসীরবেত্তা বলেন- আলোচ্য আয়াতে কারিমা পবিত্র মক্কার মুশরিক প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা রসূলে খোদা মাহবুবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে খানায়ে কাবায় নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং ষষ্ঠ হিজরীতে বায়তুল্লাহর ওমরা আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বীয় ঘরের দরজায় নামায আদায়ে বাধা দেয়। যার দরুন তাদেরকে পবিত্র মুক্কা মুকাররমা হতে মদিনায়ে মুনাওয়ারায় হিজরত করতে হয়।

[তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান ও নঈমী শরীফ]

আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত জরুরি মাসায়েল : উদ্ধৃত আয়াতে কুরআনের মর্মবাণীর আলোকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও শরয়ী বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। যথা- তাযীম, সম্মান ও শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী শরীফের অবমাননা যেমনি বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা

একইভাবে প্রযোজ্য। এজন্য আয়াতে বায়তুল মুকাদ্দাস কিংবা মসজিদে হারাম শরীফকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করে 'মাসাজিদাল্লাহ' (আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত সকল মসজিদ) বলে বিশ্বের সকল মসজিদকে একই হুকুমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বাতন্ত্র্যভাবে স্বীকৃত। যেমন- পবিত্র মসজিদে হারাম শরীফের এক রাকাত নামাযের সওয়াব অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রাকাত নামাযের সমান। পবিত্র মসজিদে নববী শরীফে এক রাকাত নামায অন্যান্য স্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাযের সমান এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে এক রাকাত নামায অন্যান্য স্থানে পঁচিশ হাজার রাকাত নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত হতে সফর করে সেথায় পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্যান্য মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমির শরীফ, বাগদাদ শরীফ, মাইজভাণ্ডার শরীফ ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করতে কুরআন-হাদীসের কোথাও কোনরূপ নিষেধ কিংবা নিরুৎসাহ করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহওয়ালা ছালেহীনদের সাক্ষাতে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীসে নববীর বিভিন্ন বর্ণনায় সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন, চার মযহাবের ইমামগণ ও আউলিয়ায়ে কামেলীনের অভিমত ও বাস্তব আমল এ মাসআলার স্বপক্ষে অকাট্য ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ এ দেশের ওহাবী মওদুদিপন্থী পথভ্রষ্ট মৌলভিরা হাদীসে রাসূলের বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করে ফতোয়াবাজী করে যে, মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শিরক-বিদআত (নাউজুবিল্লাহ)। এ ফতোয়াবাজির পক্ষে কুরআন হাদীসের কোন প্রকার সমর্থন বা প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তারা শুধু শয়তানি প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে এবং অলি আল্লাহগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে এহেন উদ্ভট, ভিত্তিহীন ও মনগড়া গলাবাজি করে চলছে। আল্লাহপাক সকল মুমিন নরনারীকে এহেন গুমরাহি থেকে হেদায়ত করুন, আমিন।

মসজিদে জিকর-আযকার ও নামাযে বাধা প্রদানের যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশেপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লিদের নামায ও জিকর আযকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লিরা নফল নামায তাসবীহ তাহলিল ও তিলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও জিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ একে নাজায়েজ আখ্যা দিয়েছেন। তবে মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকে, তখন সরবে জিকর-আযকর অথবা তিলাওয়াত করাতে দোষ নেই। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামায, জিকর, তাসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত; যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে যায়। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্য কেউ না কেউ আসা কিংবা নামাযির সংখ্যা হ্রাস পাওয়া।

হাদীসে নববীর আলোকে মসজিদ : পৃথিবী পৃষ্ঠে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগি, জিকর-আযকার, তাছবীহ-তাহলিল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির জন্য স্থায়ীভাবে নির্ধারিত ও নির্মিত ঘর হলো মসজিদ। এগুলোকে আল্লাহর ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে হাদীসে নববী শরীফে। এতে প্রবেশ করা মানে আল্লাহপাকের একান্ত সাক্ষাতে-সান্নিধ্যে গমন করা। এগুলোর খেদমত যেন ঈমানের স্মারক, আল্লাহপাকের বড় ইবাদত। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে।

عن ابن مسعود (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان بيوت الله فى الارض المساجد وان حقا على الله ان يكرم من زاره فيها (رواه الطبرانى)

প্রখ্যাত ছাহাবায়ে রাসূল সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলে করিম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর হচ্ছে মসজিদ সমূহ। [আল্লাহপাকের ইবাদতের মারকায] এগুলোতে যারা আল্লাহর সাক্ষাতে গমন করবে তাদেরকে সম্মানিত করা আল্লাহপাক নিজের উপর কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। [তাবরানী শরীফ]

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غدا الى المسجد اوراح اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح. (متفق عليه)

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা হাবিবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করে, যখনই সে মসজিদে গমন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের আতিথেয়তা প্রস্তুত করেন। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يارسولالله وما رياض الجنة قال المساجد وقيل وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر- (رواه الترمذى)

সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে গমন করবে ফলমূল আহরণ করো। আরজ করা হয়, ওহে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতের বাগান কোনটি পৃথিবীতে? জবাবে আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেছেন, মসজিদ সমূহ। পুনরায় আরজ করা হয়, হে আল্লাহর রসূল! ফলমূল কি? উত্তরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-ওয়া আল্লাহু আকবর। এ তাসবিহ গুলো হল পৃথিবীতে বেহেশতের ফলমূল স্বরূপ। [তিরমিজি শরীফ]

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلوة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم- (رواه احمد وابو داؤد)

সায়্যিদুনা হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে পুতপবিত্র হয়ে ফরজ নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হয়, তার সওয়াব হল ইহরাম পরিধানকারী হজ্ব আদায়কারীর সওয়াবের সমান। [মসনদে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফ]

উল্লিখিত হাদীসে নববী শরীফের আলোকে প্রতিভাত হয়, পৃথিবীর মসজিদ সমূহ আল্লাহর ঘর, বেহেশতের বাগান। এতে গমন করা যেন আল্লাহপাকের সাক্ষাতে, বেহেশতের বাগানে গমন করা; যা মুমিনের জন্য ইহকালীন জীবনে পরম সৌভাগ্য ও পরকালীন জীবনে নাজাতের গ্যারান্টিস্বরূপ। মসজিদের আদব, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা-মহিমা যথার্থরূপে অনুধাবন করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর ঘর, বেহেশতের বাগান। এর প্রতি সর্বোচ্চ আদব প্রদর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এতে প্রবেশ করা, ইবাদত বন্দেগিতে নিয়োজিত হওয়া, জাগতিক কোন কর্মকান্ডে মশগুল না হওয়া পবিত্র কুরআনে কারীমের তাগিদ এর বিপরীত কোন আচরণে লিপ্ত হওয়া ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির কারণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমিন-বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হাদীসের আলো

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده- (بخارى شريف المجلد الاول، ص:٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করিম (দ.) এরশাদ করেছেন ঐ জাতেপাকের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি রাসূল (দ.) তার কাছে তার পিতা-মাতা এবং ছেলে-মেয়ে হতে বেশি প্রিয় না হই। [বোখারি খণ্ড-১, পৃ.৭]

ব্যাখ্যা : মুহব্বত তিন প্রকার

১. মুহাব্বতে তবয়ী বা স্বভাবগত মুহব্বত। যে মুহব্বতের জন্য স্বভাবত মানুষকে বাধ্য করে অথবা কোন বাধ্যবাধকতা ও প্রচেষ্টা ব্যতিত যে মুহাব্বতের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে। যেমন- ছেলে-মেয়ের জন্য মাতাপিতার মুহব্বত।

২. মুহব্বতে আকলী বা জ্ঞানগত মুহব্বত। স্বভাব যদিও কোন বস্তুকে অপছন্দ করে কিন্তু পরিণাম ভেবে বিবেক নিজকে তার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। যেমন- রোগীর স্বভাব ঔষধ সেবনকে অপছন্দ করা যেহেতু সে আরোগ্য লাভ করতে চায় সেহেতু তার বিবেক তাকে ঔষধ সেবনে অনুপ্রাণিত করে।

৩. মুহব্বতে ঈমানী। আল্লাহর বুজুর্গী, এহছান ও রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ ব্যতিত সবকিছুর সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

আলোচ্য হাদীস শরীফে কোন প্রকার মুহব্বতের অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে।

কেহ বলিয়াছেন যে এখানে মুহব্বতে আকলি অর্থ হইবে। অর্থাৎ ইচ্ছার পরিপন্থী হইলেও রাসূল (দ.) যদি তাহার কাফের মাতা-পিতাকে হত্যা করিতে আদেশ দেন, তাহলে মোমেন অবশ্যই তাহা করিবে। কেননা সে জানে যে রাসূল (দ.) এর আদেশ পালনের মধ্যেই তাহা যত মঙ্গল। কেউ বলেছেন যে মুহব্বতে ঈমানী অর্থ হবে। আবার কেউ বলেছেন উপরোক্ত হাদীস শরীফে মুহব্বতে তবয়ী বা স্বভাবগত মুহব্বতই উদ্দেশ্য। তাঁদের দলিল ও যুক্তি সমূহ নিম্নরূপ :

১. হুজুর (দ.) এর এরশাদ মোতাবেক তাঁকে পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে ও সবকিছু হতে অধিক ভালোবাসা না হলে মোমেন হওয়া যায় না। পিতামাতা ও ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা যেরূপ স্বভাবগত হয়ে থাকে অনুরূপভাবে হুজুর (দ.) কেও স্বভাবগত ভাবেই ভালবাসতে হবে।

২. তিন কারণে মানুষ স্বভাবগত ভাবে ভালবেসে থাকে। ক. রূপ খ. কামালিয়াত গ. এহছান। আর তিন প্রকার বিশিষ্ট হুজুর (দ.) এর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে ও অসীম পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন হিশাম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) সর্বপ্রথমে বর্ণিত হাদীস শরীফ শুনে রাসূল (দ.) এর কাছে আরজ করলেন-

يارسول الله لانت احب الى من كل شئ الا من نفسى.

ইয়া রাসুলল্লাহ, আপনি আমার নিকট আমার জান ব্যতিত অন্য সবকিছু হতে অধিকতর প্রিয়।

এ কথা শুনে রাসূল (দ.) বললেন-

لاوالذى نفسى بيده حتى اكون احب اليك من نفسك.

আল্লাহর কসম, যতক্ষণ তোমার জান অপেক্ষা বেশি

ভাল না বাসবে ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন-

والله لانت احب الى من نفسى.

আল্লাহর শপথ, আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। হুজুর এরশাদ করলেন-

الان يا عمر

হে ওমর! এখন তুমি মুমেন হয়েছ। [বুখারী]

মেরকাত গ্রন্থে হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, একমাত্র হুজুর (দ.) এর তাওয়াজ্জুহ তাঁকে এই কামালিয়াতের মহান স্তরে উন্নীত করেছে। অতপর তাঁর অন্তরে হুজুর (দ.) এর মুহাব্বত স্বভাবগতভাবেই স্থান পেয়েছে। যা দ্বারা হুজুর (দ.) তাঁর জীবনরূপ প্রিয় হয়ে গেলেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উল্লেখিত হাদীস শরীফে রাসূল (দ.) কে যে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা স্বভাবগত মুহব্বতই বুঝানো হয়েছে। মোট কথা হুজুর (দ.) এর ভালবাসার নামই ধর্ম এবং তাঁর প্রেমে বিভোর হওয়ার নামই ঈমান।

একটি সন্দেহের অবসান : এখানে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, হাদীসের ব্যাখ্যানুসারে এমন কয়জন লোক আছে যে, হুজুর (দ.) কে সবকিছু হতে এমনকি নিজের জীবন থেকেও স্বভাবগতভাবে অধিক ভালোবাসে। তাহলে কি বাকী সবাই মুমিন নয়? তার সমাধানে আমি আল্লামা কুরতুবী (রা.) এর কথাটাই নকল করছি।

তিনি বলেন- 'যার ইমান হুজুর (দ.) প্রতি সহী রয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই হুজুর (দ.) এর জন্য অধিকতর মুহব্বত থাকতে হবে। যদিও নফ্ছ ও শয়তানের প্ররোচনায় কিংবা আলস্যের কারণে সে মুহব্বত চাপা পড়ে যায়। [যার কারণে সে গুণাহের কাজও করে]।

দেখা যায়, অনেক মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে হয়ত গুনাহগার কিন্তু যখন তার সম্মুখে হুজুর (দ.) এর নাম উল্লেখ করা হয় তখন সে রাসূলে পাকের জিয়ারতের জন্য উদগ্রীব হয়ে যায়। রাসূলে পাকের অসম্মানজনক কথা শুনলে সে জান দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এতে উল্লেখিত সন্দেহের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল।

রাসূল (দ.) এর মুহব্বতের পরিচয় কি?

কাজী আয়াজ (রা.) বলেন- 'রাসূল (দ.) এর মুহব্বতের অর্থ হচ্ছে তাঁর সুন্নাতের ওপর আমল করা এবং সুন্নাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করা। সুন্নাতও শরীয়তকে বাতিলের বদ আকিদা হতে রক্ষা করার চেষ্টা করা এবং মনে মনে আশা করা যে, যদি হুজুর (দ.) কে জীবদ্দশায় পেতাম, জানমাল সবকিছু রাসূলের কদমে উৎসর্গ করতাম। আজ আল্লাহর মাহবুব (দ.) এর ইজ্জত ও শান বিলুপ্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সত্যিকার আশেকে-রাসূলের আজ একান্ত ও অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে নিজের জীবনে সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করা এবং দুশমনে রাসূলের সকল ষড়যন্ত্র ও প্রচারণার কবর রচনা করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ এমনকি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত রাসূল (দ.) এর পবিত্র কদমে উৎসর্গ করা।

এ হাদীস শরীফ দ্বারা দুটি মাসআলা প্রমাণিত হয়।

এক. বাতিলপন্থীরা আল্লাহ তা'আলার অলিগণের তাওয়াজ্জুহের কথা অস্বীকার করে। আর উপরে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে হযরত ওমর (রা.) রাসূলেপাক (দ.) এর তাওয়াজ্জুহে পূর্ণতা লাভ করেছেন।

দুই. উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে রাসূল (দ.) কে ছেলেমেয়ে মাতাপিতা হতেও অধিক ভালোবাসার নামই ঈমান। ভালোবাসা আর সম্মান পরস্পর সম্পূরক। সম্মান ব্যতিত ভালোবাসা হয় না। বুঝা গেল, হুজুর (দ.) কে ছেলেমেয়ে পিতামাতা এমনকি জীবন হতেও বেশি ভালোবাসতে ও সম্মান করতে হবে। এটাই ঈমান।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, যেন আমরা রাসূল (দ.) এর মুহাব্বত অর্জন করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আমিন।

পবিত্র রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত

শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আখতার হোসাইন

সাওম বা রোযা : সাওম বা রোযা ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের বর্ণনানুযায়ী হিজরতের দেড় বছর পর শাবান মাসের ১০ তারিখ উম্মতে মুহাম্মদী (দ.) এর উপর পবিত্র রমজান মাসের রোযা ফরজ করা হয়।

রমজানের অর্থ : হযরত উমর (রা.) বলেছেন আমি রাসূল (দ.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রমজানের ফজিলত কি? তিনি উত্তর দিলেন- রমজানকে তাওরাত-এ-'হাতু' ইনজীলে 'তাব' এবং যাবুরে কোরবাত ও কুরআন মাজীদে 'রমজান' বলা হয়েছে।

'হাতু' অর্থ গুণাহ নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'তাব' অর্থ পবিত্র হওয়া। আর কোরবাত অর্থ নৈকট্য অর্জন করা। এ রমজান মাসে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয় এবং 'রমজান' শব্দটি আরবী (রমজ) ধাতু হতে গৃহীত হয়েছে। হেমন্তকালের প্রথম ভাগে যে বৃষ্টিপাত হয় আরবগণ তাকে রমজ বলে।

আরও উল্লেখ্য যে, রমজান শব্দটির মধ্যে ৫টি অক্ষর আছে। তা হলো 'র' দ্বারা রেদ্বা বা সন্তুষ্টি 'মীম' দ্বারা মুহাব্বত 'দ্বোয়া' দ্বারা জমিন 'হামজা' দ্বারা উলফত বা ভালবাসা আর 'নুন' দ্বারা নূর বা আলো বুঝানো হয়েছে। মুফাস্সিরগণের অভিমত হল, রমজান হলো রহমানের ন্যায় আল্লাহপাকের গুণবাচক নাম। অতএব শাহরুর রমজান হল আল্লাহর মাস। যেহেতু এই মাসে দিন-রাত বিরতিহীনভাবে সিয়াম- সাধনা, ইফতার, তারাবীহ্ ও ইতিকাফ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। তাই এই মাসকে আল্লাহর মাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্য হাদীসে রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন- যে লোক পবিত্র রমজান মাসে বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় সিয়াম সাধনা করে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে খাঁটি ঈমান সহকারে অতি সওয়াবের আশায় রাত্রিকালীন ইবাদত তথা তারাবীহ আদায় করে তার অতীতের পাপসমূহ মার্জন করা হবে।

পূর্ববর্তীদের রোযা : রোযা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফরজ ছিল। তবে আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজকৃত রোযা ভিন্ন ধরনের ছিল। যেমন- হযরত আদম (আ.) প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। একে আইয়ামে বেজের রোযা বলা হয়। হযরত আদম ও মা হাওয়া (আ.) এর উভয়ের ওপর একটি বারণকৃত বিধান ছিল। তা হল-

لا تقربا هذه الشجرة

অর্থাৎ তোমরা উভয়ে গোন্ধম গাছের নিকট যেও না। কিন্তু শয়তানের প্রতারণায় তারা গোন্ধম ফল ভক্ষণ করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আদম (আ.) ৩০ দিন যাবত রোযা রেখেছিলেন। তখন কোন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না। হযরত আদম (আ.) গোন্ধম ফলের প্রভাব দূরীভূত করার জন্য ত্রিশদিন যাবত যে রোযা রেখেছিলেন তা আল্লাহর নিকট এমনভাবে কবুল হয়েছে, যার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী (দ.) তাদের রোযার সময় নির্ধারণ করলেন। হযরত নূহ (আ.) সর্বদা রোযা রাখতেন এবং হযরত দাউদ (আ.) এর ওপর একদিন পর একদিন রোযা ফরজ ছিল। হযরত মুসা (আ.) এর উম্মতের ওপর আশুরার দিনের রোযা, সাপ্তাহিক প্রতি শনিবারের রোযা ফরজ ছিল। হযরত মুসা (আ.) এর উম্মতের ওপর আশুরার দিনের রোযা, সাপ্তাহিক প্রতি শনিবারের রোযা। এছাড়া বছরের মধ্যে আরো অনেক রোযা ফরজ ছিল। হযরত ঈসা (আ.) এর উম্মতের ওপর একদিন রোযা রেখে দুই দিন ছেড়ে দেওয়া এভাবে সারা বছর রোযা রাখার বিধান ছিল। আর উম্মতে মুহাম্মদীর বেলায় বছরে একমাস রোযা রাখতে হয়।

মাহে রমজানের বৈশিষ্ট্য : মাহে রমজানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বাকি এগার মাসের উর্ধ্বে। এইমাসে

মানবতার মুক্তির দিশারী মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল হয়েছে। রমজান মাস একটি পূণ্যময় মাস এবং এ মাসেই ইবাদত ও আনুগত্যের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। রমজানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন- রমজান এমন একটি মাস যে মাসে পবিত্র কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। লায়লাতুল কৃদর রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে মহান নিয়ামত আল্লাহপাক উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করেছেন। এছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে ইমাম আহমদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (দ.) এরশাদ করেন- হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর নাজিলকৃত সহীফা রমজানের প্রথম তারিখে নাজিল করা হয়েছে। রমজানের পঞ্চম তারিখে হযরত মুসা (আ.) এর ওপর তাওরাত এবং ১৩ তারিখে হযরত ঈসা (আ.) এর উপর ইঞ্জিল কিতাব আর রমজানের ২৭ তারিখে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দ.) এর ওপর কুরআনুল কারীম নাজিল হয়েছে। আবার হযরত জাবির (রা.) এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়- এই মাসের ১২ তারিখে আসমানি কিতাব অর্থাৎ 'যাবুর' হযরত দাউদ (আ.) এর উপর নাজিল হয়েছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বনি আদমকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যে মাসে সমস্ত আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছিল সেই মাস হচ্ছে মাহে রমজান। এটি এমন একটি মাস যে মাসের একটি নেক আমল অন্য মাসের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি।

রোযার দৈহিক উপকারিত : প্রখ্যাত মণীষীরা সিয়াম বা রোযার অন্তর্নিহিত বিষয়ের ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রোযা পালনের নির্দেশ হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রোযাদার রোযা পালনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করতে পারে। এই কথা বিশ্বের বড় বড় ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় বরং ইসলামের একমাস সিয়াম বা রোযা পালনের বিধান যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও স্বাস্থ্যসম্মত তাও তারা স্বীকার করেছেন। প্রতিবছর একটানা ত্রিশদিন রোযা পালন করলে মানুষের আত্মারই শুধু উৎকর্ষ সাধন হয় না বরং মানব দেহের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। সারা বছর শরীরে যে বিষয় উৎপন্ন হয়, রোযার মাধ্যমে তা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখ্য যে, বিষ এর পরিমাণ বেশি হলে মানবদেহের জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। রমজান মাসে মুখ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। অধিক বা অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার কারণে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। সারাদিন রোযা রাখার ফলে রোযাদারদের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং ইফতারের সময় ক্ষুধার তীব্রতার দরুন খাদ্য সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হয়। ফলে পরিমিত ইফতার গ্রহণে রেযাদার শারীরিক ও আত্মিক উভয়দিক শান্তি লাভ করে। ত্রিশদিন রোযা রাখার ফলে রোযাদারদের পরিপাক যন্ত্রগুলো শক্তি লাভ করে। পতিত জমির মত শক্তি অর্জন করে থাকে। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক গোলাম মোয়াজ্জেম কর্তৃক ১৯৬০ সালে মানব শরীরের ওপর রোযার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণামূলক তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, রোযা দ্বারা শরীরের ওজন সামান্য হ্রাস পায় বটে। কিন্তু তা শরীরের কোন ক্ষতি করে না। বরং শরীরের অতিরিক্ত 'মেদ' কমাতে রোযা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা কার্যকর। তার গবেষণা তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, যারা মনে করে রোযা রাখলে 'শূল' বেদনার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় আসলে তাদের ধারণা ঠিক নয়। বরং রোযা রাখলে এসিড কমে যায়। কিন্তু ভোজনে তা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ডা. ফ্রাইডসহ বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন ইসলামে সিয়াম সাধনার বিধান স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ফলপ্রসু। তাই দেখা যায় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রোগব্যাধি তুলনামূলক অন্য এলাকার চেয়ে কম। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন- দীর্ঘজীবন লাভ করার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি নয়। 'বেশি বাঁচবি তো কম খাবি' এই প্রচলিত প্রবাদটি আসলেই সত্য।

আত্মশুদ্ধির মাস মাহে রমজান : মানুষের শরীরের

চালিকাশক্তি হল মানুষের আত্মা যেদিকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে।

সুতরাং আত্মপরিশুদ্ধ হলে ব্যক্তি সৎকাজে ব্রতী হয়। তার আত্মা অশুদ্ধ হলে ব্যক্তি অসৎ বা অন্যায় কাজে পা বাড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং সৎচরিত্র অর্জনে আত্মার ভূমিকাই প্রধান। আর সে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহপাক রোযার বিধান প্রবর্তন করেছেন। আত্মা পরিশুদ্ধতার অন্যতম উপকরণ হল উপবাস থাকা। রোযার রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শায়খ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বর্ণনা করেন-

'রমজান' শব্দটি 'রমজ' মূল ধাতু হতে। যার অর্থ হল- জ্বালিয়ে ফেলা।

'রমজান' সর্বোপরি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে থাকে। আর এর দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। রোযাদারের উপবাসের মাধ্যমে মানবজাতির উপাদান সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন বিবেক বা আকল এবং নফস্ বা আত্মাকে। অতপর আকল বা বিবেককে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন যে, তুমি কে? আর আমি কে? আকল বা বিবেক উত্তর দিলেন- আপনি আমার প্রভু এবং আমার সৃষ্টিকর্তা। আর আমি আপনার অনুগত এক দুর্বল বান্দা। আকল বা বিবেক এর সুন্দর উত্তর শুনে আল্লাহপাক খুশি হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে নফসকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন- তুমি কে? আর আমি কে? নফস বা আত্মা উত্তর দিল তুমি তুমিই। আর আমি আমিই। নফস এর এরূপ অহংকারপূর্ণ জবাবে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন- অকৃতজ্ঞ নফস তুমি আমার শুকরিয়া আদায় কর নাই। আল্লাহ ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন এই অকৃতজ্ঞ নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। আদেশ পেয়ে ফেরেশতা এই নফসকে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে একশত বছর উত্তপ্ত আগুনে পোড়ালেন। অতপর আল্লাহর সামনে আবার হাজির হলেন। এবার পুনরায় প্রশ্ন করলেন তুমি কে? আর আমি কে? নফস এর অহংকার এতটুকু হ্রাস পেল না বরং পূর্বের ন্যায় বলে উঠল, তুমি তুমিই, আর আমি আমিই। আল্লাহ বললেন- একে এমন শাস্তি দেয়া হোক যাতে করে তার অহংকার শীতল হয়ে পড়ে। ফেরেশতা এবার তাকে প্রচণ্ড ঠান্ডা পানিতে এক বছর মতান্তরে একশত বছর ডুবিয়ে রাখলেন। তখনকার পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির করা হল।

এবার আগের মতই একই প্রশ্ন করা হল এবং সে ঠিক একই উত্তর দিল। অহংকার আগের মতই রয়ে গেল। শেষবারের মত আল্লাহপাক ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন এই অহংকারী নফসকে ভীত করার জন্য এমন একটি উপযুক্ত শাস্তি রয়েছে যার মাধ্যমে সে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

আর সে উপযুক্ত শাস্তি হল- একমাস খাবার দেওয়া থেকে তাকে বিরত রাখা হোক। ফেরেশতা আল্লাহর হুকুম পেয়ে তাই করলেন। দেখা গেল কয়েকদিন যেতে না যেতেই তার উপবাসের কারণে তার ভিতর আমূল পরিবর্তন এসে গেল এবং একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। তার অহংকার চিরতরে বিদায় নিল। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আগের মত প্রশ্ন করল- তুমি কে? আর আমি কে? অত্যন্ত আনুগত্য সহকারে কাকুতি মিনতি করে বলে উঠল তুমি আমার প্রতিপালক, আমার সৃষ্টিকর্তা আর আমি তোমার দুর্বল বান্দা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল যে, নফসকে প্রচণ্ড আগুন আর ঠাণ্ডা পানি, দুর্বল করতে পারেনি। বরং নফস দুর্বল হয়ে পড়েছে একমাত্র দীর্ঘ একমাস উপবাসের মাধ্যমে। মূলত এই কারণে একমাস রোযার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

রোযা তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায় : মুসলমানেরা সার্বিক জীবনে রোযার অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ রোযা কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরজকৃত নতুন ইবাদত নয়। বরং তা পূর্ববর্তীগণের ওপরও ফরজ ছিল।

كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

অর্থাৎ তোমাদের উপর রমজানের রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপরও রোযা ফরজ করা ছিল। তাকওয়া বা খোদাভীতি হওয়ার একমাত্র উপকরণ দীর্ঘ একমাস রোযা।

পূর্ববর্তীগণও রোযা রেখে আসছেন। যেমন- হযরত আদম (আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল উম্মতের ওপর রোযা ফরজ ছিল। তবে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের সাথে বর্তমান এর ফরজকৃত রোযার সংখ্যা, সময়সীমা ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। মূলত রোযা বা সিয়াম সাধনা এক কষ্টসাধ্য ইবাদত। কারণ রোযা শুধু নিবারণের নাম মাত্র নয়। শরীরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গরাও রোযা রয়েছে। হাত, পা, চক্ষু, লজ্জাস্থান, কান, অন্তর সকল অঙ্গকে পরিহার করে শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার নামই রোযা। আর এ রোযা সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে খোদাভীরু করা। এই মাসে সাধারণত ইবাদতের পরিমাণ দশগুণ হতে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রোযার ব্যাপারটা তার ব্যতিক্রম। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদ্‌সিতে এরশাদ করেন- রমজানের রোযা ছাড়া অন্যসব ইবাদতের বদলা দশগুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে।

কিন্তু রোযা আমার। এর প্রতিদান আমিই দিব। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, রোযার প্রতিদানের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। স্বয়ং আল্লাহ তার দায়িত্ব কুদরতি হাতে গ্রহণ করেছেন। এমন কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলি করলে এক একটি নিসবত হয়ে থাকে। হজ্ব করলে হাজী বলে, যাকাত দিলে সমাজে একটা পরিচিতি আছে। নামায পড়লে সে নামাযী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাতের গভীরে ঘুম থেকে উঠে রোযার উদ্দেশ্যে সেহেরী খেল এবং সারাদিন রোযা রাখলেন কিনা তা কেউ বুঝতে পারে না। কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু খেলে তা জানার জন্য সাধ্য কারও নেই। সুতরাং রোযা রাখে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে। তাই রোযার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিবেন এবং রোযা হল তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায়।

সাহরীর গুরুত্ব : পবিত্র মাহে রমানের রোযা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহরী বলে নামকরণ করা হয়েছে।

সাহরী খাওয়া সুন্নাত। ক্ষুধা না থাকলেও রমজান মাসে শেষ রাতে যা খাওয়া হয় তাই সাহরী। অন্তত দু'একটি খোরমা বা খেজুর অথবা একটু পানি পান করলে সাহরী আদায় হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী নবীদের নিকট রোযা ছিল। কিন্তু রমজানের সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না। কোন সময় সাহরীর সময় হবে এবং কতটুকু সময় তা নির্ধারণ ছিল না। পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে রোযার সময় নির্ধারণ হওয়ার পূর্বে রোযা প্রচলন ছিল। ঘুমের পর হতে অর্থাৎ যখন ঘুম শুরু হয়েছে তখন থেকে তার রোযা শুরু হতো। এমনকি স্ত্রী সহবাসও বৈধ ছিল। পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون - الى اخر اية

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন- রোযা সমূহ এর রাতগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকট যাওয়া তোমাদের নিকট হালাল রয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মাগুলো অবিশ্বাসীদের মধ্যে ফেলেছিলে। অতপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গী হও এবং তালাশ কর আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর 'বিশ্বস্ততা' বলতে ওই স্ত্রী সহবাস বুঝায় বা বৈধ হবার পূর্বে রমজানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। সে কর্মকান্ডের ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এমনকি ধৈতা নির্দেশক ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমজানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধতা করা হয়েছে। স্ত্রী সঙ্গম বংশ বিস্তারও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যই এই বিধানকে বৈধ করা হয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়। আর পূর্ববর্তী শরীয়ত গুলোতে ইফতারের পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা এশার নামায পর্যন্ত হালাল ছিল। এশার নামাযের পর এসব কর্মকান্ড হারাম হয়ে যেতো। এ বিধান হুজুর (দ.) এর যুগ পর্যন্ত বহাল ছিল। কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমজানের রাত্রি সমূহের এশার নামাযের পর স্ত্রী সহবাস ভুলক্রমে

হয়ে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন। এজন্য সাহাবীরা লজ্জিত হলেন এবং রাসূলপাক (দ.) এর দরবারে নিজের অবস্থা পেশ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন। ভবিষ্যতের জন্য রমজানের রাত্রি সমূহের মাগরিব থেকে সুবহে সাদিক এর আগ পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো। [তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান]।

অন্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন-

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط - الى اخر اية

অর্থাৎ তোমরা খাও এবং পান কর যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যায় কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা। অর্থাৎ তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা গুলোকে সম্পূর্ণ কর এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাক। যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় থাক। এসবকিছু আল্লাহর সীমারেখা যার নিকটে যেও না। আল্লাহ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নির্দেশগুলো। যাতে পরহেজগারী অর্জিত হয়।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তা'আলা রমজানের সময়সীমার কথা উল্লেখ করেন। কেননা- আয়াতে করিমাগুলো হযরত সামায়হ্ বিন কায়েস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত সামায়াহ-বিন-কায়েস (রা.) একজন মেহনতি লোক ছিলেন।

রোযা অবস্থায় আপন জমিতে কাজ করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। তার স্ত্রী রান্নায় মশগুল ছিলেন। এদিকে তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে তার চোখে নিদ্রা এসে গেল। যখন খাবার তৈরি হল তাকে জাগ্রত করলো তখন তিনি আহারে অস্বীকৃতি জানালেন।

কেননা সে যুগে ঘুমিয়ে পড়ার পর হতে রোযাদারের পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় পরের দিন সাহাবী হযরত সামায়াহ বিন কায়স (রা.) নিজস্ব কাজরত অবস্থায় দুপুরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এই ঘটনাটি রাসূল (দ.) এর দরবারে বর্ণনা করা হল-

ইয়া রাসূল (দ.) আপনার সাহাবী হযরত সামায়াহ-বিন-কায়স (রা.) বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াতখানা নাযিল হয়। রমজানের রাত্রিগুলোতে পানাহার বৈধ হল। যেমনি ভাবে হযরত ওমর (রা.) এর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে স্ত্রী সহবাস হালাল হয়েছে। রাতকে কৃষ্ণ রেখা ও সুবহে সাদেকের শুভ্র রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। এই অর্থ হচ্ছে যে, তোমাদের জন্য পানাহার করা রমজানের রাত গুলোতে মাগরিব থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে। [তাফসীরে আহমদী]

রাসূল (দ.) বর্ণনা করেছেন তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরী খাওয়াতে বরকত আছে। মাহে রমজানে সাহরী খাওয়ার মূল সময় হল সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যত ঘন্টা আছে তার ছয় ভাগের শেষ ভাগ। অর্থাৎ ষষ্ট ভাগ। যদি কেউ এর আগে ভাত খায় কিংবা চা পান করে তাতেও মুস্তাহাব আদায় হবে।

যদি শেষ রাতে ঘুম না ভাঙ্গে এবং এজন্য সাহরী খেতে না পারে তাহাকে সাহরী না খেয়ে রোযা রাখতে হবে। সাহরী না খাওয়ার কারণে রোযা ছেড়ে দেওয়া গুণাহ।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল পাক (দ.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের (ইহুদি, খৃস্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হল- সাহরী খাওয়া নিয়ে। রাসূল (দ.) স্বয়ং সাহরী গ্রহণ করতেন এবং তার প্রিয় সাহাবীরাও সাহরী খেয়ে রোযা রাখতেন।

অতএব আমাদের উচিত সময়মত মাহে রমজানের রোযা রাখার জন্য সাহরী খাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময় ইফতার করা।

ইফতারের গুরুত্ব : ইফতার এর শাব্দিক অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সূর্যাস্তের

পর রোযা সমাপ্তির জন্য পানাহার করাকে ইফতার বলে। আর ইফতারের সময় হল সূর্যাস্ত হয়ে গেছে তখন আর দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব। যে পর্যন্ত সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে সে পর্যন্ত ইফতার করা জায়েজ নাই। ঘড়ির হিসাবে সময় হলেও একটু বিলম্ব করে ইফতার করা ভাল। অন্ধকার হওয়ার জন্য বিলম্ব করে ইফতার করা উচিত নয়। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ। হাদীস শরীফে আছে-

عن ابى هريرة (رض) لايزال الذين ظاهرا ما عجل الناس من الفطر لان اليهود والنصارى يوزون.

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত- সর্বদা দ্বীনে ইসলামই বিজয়ী হবে এবং মানুষ ইফতার সূর্যাস্তের সাথে সাথে করে ফেলবে। কারণ ইহুদি ও খৃস্টানগণ ইফতার বিলম্ব করে।

عن سهل (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

অর্থাৎ হযরত সাহল (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন- মানুষ তথা মুসলমানগণ সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকে। যতদিন তারা ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করে নেবে। খোরমা, খেজুর, কিচমিচ অথবা পানি দিয়ে ইফতার (বুখারী ও মুসলিম) করা ভাল। খোরমার অভাবে অন্য কোন মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন- শরবত বা দুধ অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা উত্তম।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) নামাযের আগে কয়েকটি খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও যদি না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ, মিশকাতুল মাসাবীহ]

আসমানী কিতাব নাজিলের মাস : পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

شهر رمضان الذين انزل فيه القران هدى للناس ... الخ

মাহে রমজান এটি এমন একটি মাস যাতে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ নির্দেশ। কেবল পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এমনটি নয় বরং সমস্ত আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছে এই মাসেই। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ওপর অবতীর্ণ সহীফাসমূহ নাজিল হয় রমজান মাসের প্রথম তারিখে। এই রমজান মাসকে আল্লাহপাক তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম দশদিন হল রহমতের অংশ। দ্বিতীয় দশ দিন হল মাগফিরাতের অংশ এবং শেষ দশদিন হল দোজখ ও আযাব হতে নাযাত বা মুক্তির দশক। তাই রমজানের প্রথম দশদিনে আল্লাহপাক তার বান্দাহদেরকে বিশেষ ধরনের রহমত দানে ধন্য করেন। আর যারা সত্যিকার অর্থে রোযা পালন করে তাদেরকে আল্লাহপাক ব্যাপকহারে রহমত বা দয়া করে থাকেন। তা কেবলমাত্র রমজানের উসিলায়।

অপর হাদীসে রয়েছে এই মাসের প্রথম তারিখেই মহান আল্লাহ কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাদেরকে ডেকে নির্দেশ প্রদান করেন। যাতে এ মাসে রোযাদারের আমলনামায় শুধু সওয়াবই লেখা হতে থাকে এবং কোন গুণাহ যাতে লেখা না হয়। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলাকে রোযাদারের পূর্ববর্তী গুণাহ ক্ষমা করে দেন। এই সম্পর্কে কয়েকটি তফসীরকারকদের অভিমত আছে। যথা- এক. রমজান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে কুরআনপাক অবতীর্ণ হয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র রমজানুল মুবারক উম্মতে মুহাম্মদীর শান্তি এবং ইহকালীন ও পরকালীন নাজাতের মাধ্যমে এবং আল্লাহ তাঁর হাবীব (দ.) এর দরবারে কবুল হওয়ার তওফিক দান করুন। [আমিন, ছুম্মা আমিন]

যাকাতের গুরুত্ব, যাকাতযোগ্য সম্পদ এবং দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঠিক যাকাত বন্টন-নীতির ভূমিকা

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

যাকাত হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক পরিশোধ ব্যবস্থা। যা সাধারণত ধনী বা সম্পদশালী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ [যথা- সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের মালামাল, কৃষি উৎপাদন, খনিজ সম্পদ, গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, উট, ঘোড়া] থেকে খোদার নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে [যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ ও যাকাতের হার বিভিন্ন সম্পদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম] নির্দিষ্ট আট প্রকার যথা- ফকীর, মিসকিন, যাকাত সংগ্রাহক কর্মচারী, নও মুসলিম, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে বা আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও মুসাফির দীনহীন-নিঃস্ব-গরীব ও আর্ত-মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয়। যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিশোধক ও পরিধর্ক। যাকাত ব্যবস্থার ফলে যাকাত দাতা ও যাকাত গ্রহীতা উভয়েরই সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক অর্থে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় যা অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

[আমার প্রণীত 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' দ্রষ্টব্য।]

যাকাতের গুরুত্ব

(ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত :

১. যাকাত ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

২. মহান আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী করিম (দ.) যাকাতকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

৩. যাকাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজিদে ৩৭ স্থানে বর্ণনাও নির্দেশনা দিয়েছেন। কোরআন মজিদের যে সকল সুরায় যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো হলো :

আল বাকারা (আয়াত- ৩, ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭ ও ২৭৭), আন-নিসা (আয়াত- ৭৭ ও ১৬২), আল-মায়েদা (আয়াত- ১২ ও ৫৫), আল-আনফাল (আয়াত-৩), আত-তওবা (আয়াত- ৫, ১১, ১৮ ও ৭১), আর-রাদ (আয়াত- ২২), ইব্রাহিম (আয়াত-৩১), মরিয়ম (আয়াত- ৩১ ও ৫৫), আম্বিয়া (আয়াত- ৭৩), হজ্ব (আয়াত- ৩৫, ৪১ ও ৭৮), মুমিন (আয়াত- ২), আল নূর (আয়াত- ৩৭ ও ৫৬), আন-নমল (আয়াত-৩), লোকমান (আয়াত-৪), আল-আহ্যাব (আয়াত-৩৩), ফাতির (আয়াত-৩৯), শুআরা (আয়াত-৩৮), মুজাদালা (আয়াত-১৩), মাআরিজ (আয়াত-২৩) মুজ্জাম্মিল (আয়াত-২০), মুদ্দাচ্ছির (আয়াত-৪৩), বাইয়েনাহ (আয়াত-৫) ও আল-মাউন (আয়াত-৫)।

এ সকল সুরাগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে মক্কি এবং কিছু হচ্ছে মাদানী। মক্কি সুরাগুলোতে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'যাকাত একটি ইবাদত', 'যাকাত সম্পদ বৃদ্ধিকারী', 'যাকাত পবিত্রতা দানকারী' প্রভৃতি বাণী দ্বারা যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং মাদানী সুরা সমূহে যাকাত প্রদানকে বাধ্যতামূলক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও' [সূরা তওবা, আয়াত ৪৩ ও ১১০; সুরা নিসা, আয়াত ৭৭]

৪. আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরজ করেছেন প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে এবং যাকাতের হার, অনুপাত, নিসাব প্রভৃতি নির্ধারণ করেছেন হযরত রসূলে করিম (দ.) স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক পরোক্ষ ওহী (ওহী গায়ের মতলু) প্রাপ্তির মাধ্যমে। তাই যাকাত-

ক. আদেশের দিক থেকে ধর্মীয়;

খ. উৎপত্তির দিক থেকে স্বর্গীয়;
গ. প্রকৃতিগত দিক থেকে নৈতিক;
ঘ. আওতা ও প্রয়োগের দিক থেকে সামাজিক।

৫. উৎপাদনে যেরূপ পুঁজি ও শ্রমের অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলারও অধিকার রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা চাঁদের আলো, সূর্যের কিরণ, মাটি, বাতাস, বৃষ্টি প্রভৃতির যোগান না দিলে উৎপাদিত বস্তু পাওয়া সম্ভব হতো না। তাই সম্পদে আল্লাহর অংশ থাকা ন্যায়সঙ্গত। বলাবাহুল্য, যাকাত হচ্ছে সম্পদে আল্লাহর অংশ বা হিস্সা। (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৪১)

৬. নামায হচ্ছে দেহের মাধ্যমে ইবাদত এবং রূহানী ইবাদত। অন্যদিকে যাকাত হচ্ছে খোদার প্রতি চরম আনুগত্য ও বিশ্বাসের বস্তু। যাকাত হচ্ছে সম্পদ বা সম্পত্তির মাধ্যমে ইবাদত।

৭. যাকাত যাকাতদাতার সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে।

৮. যাকাত প্রদানের ফলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং যাকাত দাতার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা রূম, আয়াত-৩৯)।

৯. যাকাত গরীব-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরঞ্চ গরীব-দুঃখীর হক। (সূরা আয্যারিয়াত, আয়াত-১৯)

১০. যাকাত ছাড়া নামায কবুল হবে না। [হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালিদ (রা.)]।

১১. যাকাত দাতা স্বেচ্ছায় যাকাত না দিলে জোরপূর্বক রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। (আল হাদীস, আহমদ নাসাঈ ও বায়হাকী)

১২. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। [হযরত আবু বকর (রা.)]।

১৩. যাকাত প্রদান করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে যাকাত দেয় না, তার ধ্বংস অনিবার্য। (সূরা : হা-মীম, আস-সিজদা : আয়াত যথাক্রমে- ৮ ও ৭)।

১৪. যে যাকাত ও সালাতের মধ্যে পার্থক্য করে সে মুসলিম নয়। (ফতোয়া-ই-আলমগীরি, পৃ. ২৩৯)

১৫. যারা যাকাত প্রদানের সামর্থ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দেয় না তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আজাব ও জাহান্নাম (সূরা ইমরান, আয়াত ১৮০; সূরা তওবা, আয়াত ৩৪ ও ৩৫; বুখারী শরীফ; ইমাম আহমদ; ইবনে খোজায়মা; ইবনে হাব্বান)।

১৬. যাকাত প্রদান না করলে কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে, সম্পদ বিনষ্ট হবে। (হাকেম ও বায়হাকী; বাজ্জার)।

১৭. যাকাত পাপ মুছে দেয়, সম্পদে বরকত আনে, সাফল্য দেয় ও খোদার রহমত অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। (তাবরানী, ইবনে খুযাইমা ও হাকীম; বুখারী মুসলিম, তিবরানী, আওসাত)।

১৮. যাকাত ইসলামের সেতু। (তিবরানী আওসাত ও কবীর)।

১৯. যাকাত দাতার সম্পদ সুদৃঢ় দুর্গে সংরক্ষিত থাকে। (তিবরানী ও বায়হাকী)।

২০. সম্পদ যেন কেবলমাত্র ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা হামার : ৭)

(খ) সুফীগণের দৃষ্টিতে

সাধারণ মুমিনগণ ইবাদত করে দোযখের ভয়ে এবং বেহেশতের আশায়। সুফীগণ ইবাদত করে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবার আশায়, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হবার জন্য। সুফীগণ তাই ধনসম্পদ পুঞ্জিভূত করা বা জমা করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে আমার হাবিব) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, আমরা অন্যদের প্রয়োজনে কি পরিমাণ ধন, সম্পদ ব্যয় করব? আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই অন্যদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য।' (২:২৯৯)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জীবনধারণের জন্য যতটুকু সম্পদের প্রয়োজন তার বেশি জমা করা আল্লাহ ও রসুল (দ.) এর কাম্য নয়। তাই সুফীগণ বাধ্যতামূলক দানের চাইতে ঐচ্ছিক দানে বেশি আগ্রহী। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১. হযরত রসূলে করিম (দ.) কখনো তিনদিনের বেশি সম্পদ জমা রাখতেন না। ওহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা থাকলেও তা তিনি তিনদিনের মধ্যে বন্টন

করে দিতেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। একবার আবিসিনিয়ার বাদশাহ হযরত রসূল (দ.) কে দু'মণ কস্তুরী উপহার দিলে হযরত রসূল (দ.) তা সাথে সাথে দান করে দেন।

২. একটি জঙ্গলের দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত রসূল করিম (দ.) এর কিছু ছাগল ছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে সাথে সাথে তিনি তাকে ছাগলগুলো দান করে দেন। [হযরত ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত]।

এ ঘটনার পর এক ব্যক্তি নিজ গোত্রের মানুষের কাছে গিয়ে বলল, 'হে আমার স্বগোত্র! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। হযরত রসূল (দ.) এত বেশি দান করেন যে, তাঁর নিজের দরিদ্র হবার খেয়াল পর্যন্ত থাকে না।'

৩. এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করিম (দ.) কে একহাজার দিরহাম উপহার দিল। সাথে সাথে তা তিনি চাদরে ঢেলে দান করে সকল দিরহাম নিঃশেষ করে দিলেন। অথচ এ সময়ে তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। [হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত]।

৪. সুফী মশায়েখগণের একটি দল যাকাত প্রদান করাকে কার্পণ্য মনে করেন। কারণ সারা বছর গরীব দুঃখীর খবর না নিয়ে সম্পদ জমা করে কেবলমাত্র বছরান্তে দু'চারশত টাকা যাকাত দিয়ে খোদার নেয়ামতের হক আদায় করা যায় না। দানশীল ব্যক্তিরা যাকাতযোগ্য উদ্বৃত্ত জমা রেখে বছরান্তে যাকাত প্রদান ফরজ হবার অপেক্ষায় থাকতেই পারে না। 'কাশফুল মাহযুব' হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ, (অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজুল হক)।

৫. এমন কোন সম্পদ থাকাই উচিত নয় যাতে যাকাত ফরজ হয়। (হযরত শিবলী (রা.)।

৬. তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সকল সম্পদ দান করেছিলেন। হযরত রসূলে করিম (দ.) কে তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল (দ.)ই যথেষ্ট। (কাশফুল মাহযুব)

৭. হযরত আলী (রা.) বলেন, 'আমার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, দানশীলদের ওপর যাকাত কি ওয়াজিব হয়'? (কাশফুল মাহযুব)। অর্থাৎ দানশীলদের কাছে উদ্বৃত্ত থাকে না বলে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

৮. হযরত আবুজর গিফারী (রা.) ধনীদের অতিরিক্ত সমুদয় সম্পদ বিত্তহীনদের মাঝে বিলিবন্টনের নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন। এজন্য তিনি বিত্তশালীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছিলেন।

নবী-প্রেমিক সাহাবায়ে কেরামগণ ও সুফী মাশায়েখগণ এ নীতিরই অনুসারী ছিলেন। তাঁরা সম্পদ জমা রাখাকে অপরাধ মনে করতেন এবং যা হাতে আসতো তা সাথে সাথে দান করে দিতেন। ফলে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতো না, দারিদ্র দূর হতো এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকত। ফলে দুনিয়াতে স্বর্গসুখ অনুভূত হতো।

(গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে :

১. যাকাত অর্থ সঞ্চালনে সহায়তা করে।
২. যাকাত সম্পদের পুঞ্জিভূত হওয়া হ্রাস করে।
৩. যাকাত অলস সম্পদকে সচল করে।
৪. যাকাত বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
৫. যাকাত ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ায় ও চাহিদা সৃষ্টি করে।
৬. যাকাত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেও দারিদ্র হ্রাস করে।
৭. যাকাত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়।
৮. যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়-বৈষম্য কমায়।
৯. যাকাত বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মধ্যে হিংসা, সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হ্রাস করে।
১০. যাকাত সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা, উন্নতি ও প্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।
১১. যাকাত সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

গজলের অন্তরালে মাইজভাণ্ডারী শরাফত (পর্ব-২)

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আলক্বাদেরী
প্রধান মুহাদ্দিস, গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরত প্রকাশের জন্য একেক সময় একেক পন্থা অবলম্বন করেছেন। কখনো তিনি আসমান নিয়ে গবেষণার কথা বলেছেন, আবার কখনো উট সম্পর্কে ধ্যান দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবার কখনো তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে স্বীয় কুদরত প্রকাশ করেছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা খোদার কুদরত নানা উপায়ে দেখিয়েছেন। আল্লাহকে স্মরণ করার ক্ষেত্রেও তাঁদের পদ্ধতি ছিল ভিন্নতর। যেমন বিশ্ববিখ্যাত কবি, বুলবুলে শীরাজ, হযরত খাজা মোসলেহ উদ্দীন সা'দী শীরাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির (হযরত শেখ সা'দী) কথা বিবেচনা করি. তিনি বলেন-

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ☆ ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار

উচ্চারণ- বর্গ দরখশানে সব্জ, দর নজরে হুশিয়ার, হার ওয়ার্কে দপ্তরীস্ত, মাআ'রফতে কির্দেগা-র ॥

অর্থাৎ 'জ্ঞানী লোকের দৃষ্টিতে সবুজ বৃক্ষের প্রতিটি পাতার মূল্যায়ন হলো- প্রতিটি পাতাই আল্লাহর মারফত বা পরিচিতি হাসিলের এক একটি দপ্তর (মাধ্যম)'।

আল্লামা শেখ সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টিতে যদি প্রতিটি পাতার মূল্যায়ন এই হয়, তবে খোদায়ী প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের অবস্থান কী হতে পারে? আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখি, একটি গাছে যত সংখ্যক পাতা রয়েছে তার মধ্যে কোনটির সাথে কোনটি শতভাগ সদৃশ নয়। আয়তন, আকৃতি, রং প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলে বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট। একই প্রজাতির প্রতিটি গাছও তার পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা সহকারে কতইনা বৈচিত্র্য। সেক্ষেত্রে একজন বান্দাওতো কুদরতের একটা নিদর্শন হওয়াটা স্বাভাবিক। আর নবী-রাসূলের অবস্থা, আউলিয়া কেরামের অবস্থাও তাই। আল্লাহর কুদরতের এ কিরিশমা দেখে বিভিন্ন বান্দাগণ বিভিন্নভাবে ভাবমগ্ন হয়েছেন। হযরত খাজা আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রাহ.) তাঁর ভাবধারা থেকে একটি কসীদা রচনা করেছেন। তিনি বলেন-

آستیں برر خ کشیدہ ہمچو مکار آمدی ☆ باخودی خود در تماشا سوئے بازار آمدی

উচ্চারণ: ১. আ-স্তী বর রুখ কাসীদা. হাম্ চু মক্কা-র আ-মদী বা খুদী খোদ দর তামাশা সূয়ে বা-জার আমদী ॥

অর্থাৎ 'তুমি তোমার সৌন্দর্যপূর্ণ পবিত্র চেহারায় পর্দাবৃত করে একজন সুকৌশলীর ভঙ্গিমায় নিজেকে প্রকাশ করেছো। নিজে নিজে স্বীয় কর্মকান্ডে বিশ্ববাসীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছো'।

در بہاراں گل شدی و صحن گلزار آمدی ☆ بعد ازاں بلبل شدی بنالہ و زار آمدی
شور منصور از کجا و دار منصور از کجا ☆ خود زدی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی
خود شدی یوسف جمال خویشتن آراستی ☆ بعد ازیں بلبل شدی بنالہ و زار آمدی
خویشتن را جلوہ کردی اندریں آئینہ ہا ☆ آئینہ اکش نہادی خود با ظہار آمدی
گفت قدوسے فقیرے در فنا و در بقا ☆ خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

হযরত খাজা আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রাহ.)'র উল্লেখিত ছয়টি কসীদা আমি পূর্ব লিখার (১ম পর্বে) মধ্যে শুধু অনুবাদ লিখেছি। এবারের পর্বে ফার্সী ইবারত ও উচ্চারণসহ দেওয়া হলো-

২. দর বাহা-রাঁ গুলশুদী ওয়া চেহেনে গোলজার আমদী বা'দ আজাঁ বুলবুল শুদী, বনা লাওয়া যার আমদী ॥

৩. সূরে মনসুর আয় কুজা ওয়া দারে মনসুর আয়কুজা খোদ যদি বাঁঙ্গে আনাল হক বরসূরে দর আমদী ॥

৪. খোদ শুদী ইউসুফ জামালে খাইস্তন আ-রাস্তী খোদ আযীযে মিসর গস্তী, খোদ খরীদা-র আমদী ॥

৫. খাইস্তন রা জলওয়া করদী আন্দরী আয়েনাহা, আয়েনা ইসমশ্ নেহাদী, খোদ ব এজহার আমদী ॥

৬. গুপ্ত কুদ্দুসে ফকীরে দর ফানা ওয়া দর বক্বা, খোদ বখোদ আযাদ বুদী খোদ গেরেফতা-র আমদী ॥

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ক্বসীদা গুলোর অনুবাদ প্রথম পর্বে লিখা হয়েছে)।

এ মহান বুজুর্গের একই ভাবধারায় হযরত আল্লামা শাহসুফি বজলুল করীম মান্দাকিনী (রাহ.) তাঁর একটি গজলে বলেছেন-

'কে তুমি হে সখা, আড়ালে থাকিয়া, হরিলে আমারি প্রাণ,
ছলনা কৌশলে, জগৎ মজালে, এমন মোহনী জান।
রূপ মনোহর, নৈরূপবরণ, নৈরূপে পড়িয়ে রূপ আবরণ,
বহুরূপী রূপে, নিত্য নব সাজে, দেখাও রূপেরি শান'।

আল্লাহকে সম্বোধন করে মাওলানা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার কুদরতের কিরিশমা আমরা কি বুঝতে পারি? আমরা কি তোমার আশ্চর্যজনক কর্মপন্থা উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা রাখি? তোমাকে আমরা কতটুকু চিনতে পারি? তোমার ব্যাপ্তি তালাশ করা আমাদের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? তুমি তো তোমার কার্যাদি এমনভাবে পরিচালনা করে থাক, সৃষ্টিকুল কোনক্রমেই তোমাকে বুঝতে পারে না। যেখানে তোমার হাবীব (দ.) নিজেই তোমাকে চিনতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (মা আরাফনাকা হাক্কা মারফতিকা), সেখানে অন্যদের ক্ষেত্রে তো চিন্তা করাও অসম্ভব। পক্ষান্তরে, তুমি উল্লেখ করেছো যে, মানব-দানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তোমাকে চেনা। তোমার পরিচিতি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে (জ্বীন-ইনসান) সৃষ্টি করেছো বলে উল্লেখ করেছো। তোমার মারফত হাসিল করার যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেছো, কিন্তু আমাদের স্বল্প জ্ঞানে সেই লক্ষ্যে পৌছা যে অসম্ভব। সৃষ্টির আড়ালে গোপন থেকে তুমি তোমার এ সৃষ্টকে উন্মাদ করেছো। তাই তো আল্লামা মান্দাকিনী (রহ.) বলছেন, 'কে তুমি হে সখা (প্রভু) আড়ালে থাকিয়া হরিলে আমারি প্রাণ'।

এই গজলের দ্বিতীয় চরণে খোদায়ী সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক রহস্যময় ছলনা ও কৌশলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন- তুমি (আল্লাহ) হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে তোমাকে সিজদা করতে নির্দেশ না দিয়ে ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছো আদম (আ.) কে সিজদা করতে। তুমি মহান স্রষ্টার সামনে কি তোমার সৃষ্টকে সিজদা করা শোভা পায়? কিন্তু তোমার নির্দেশের সামনে কোন যুক্তি-বুদ্ধির যে স্থান নেই, তোমার নির্দেশই যথেষ্ট। তোমার এ ছলনা-কৌশল বান্দার পক্ষে বুঝা কতটুকু সম্ভব? তুমি তো পরীক্ষা করেছো, আনুগত্যের পরীক্ষা। আনুগত্যের প্রশ্নে ফেরেশতারা কতদুর না এগিয়ে ছিল এবং ফেরেশতারা সফল ছিল। তারা একযোগে সিজদা করেছিল সকল যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে গিয়ে। কিন্তু ফেরেশতা নয় এমন একজন সেখানে ছিল যে অদৃষ্টের লিখনে এবং ফেরেশতাদের অন্তর্ভূক্ত না হওয়াতে বিপদগামী হয়েছিল। এটা একটা বড় পরীক্ষা ছিল, যেখানে ফেরেশতারা কামিয়াব ছিল। সেখানে এমন একজন যে তার বৈশিষ্ট্যগতভাবে অহংকারের কারণে অনুত্তীর্ণ হয়েছিল। সে ছিল ইবলিশ।

তুমি (আল্লাহ) খলিফা (আদম) সৃষ্টি করেছো জমিনের খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালামকে হুকুম করলে জান্নাতে অবস্থান করতে। সেখান থেকে আবার তোমার কৌশলে জমিনে প্রেরণ করলে। আবার জমিনে দীর্ঘদিন একাকী জীবনযাপনের ব্যবস্থা করলে। অতপর বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) এর মহামিলনের মাধ্যমে শস্য-শ্যামল এ ধরণীতে এ বিশাল মানবগোষ্ঠিকে সাজিয়ে নবী-রাসূল, অলী, গাউস, কুতুব, আবদালের পদমর্যাদায় তাঁদেরই মাধ্যমে তোমার নৈরূপ মোহিনী সৌন্দর্য বহুরূপী রূপে সাজিয়েছো এবং নিত্যনতুন সাজে তোমার কুদরত প্রকাশ করেছো।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ.) একদিন যোহরের নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মনে মনে বলছিলেন, 'আমি যদি কখনো ইবলিশকে পেতাম তবে জিজ্ঞেস করতাম, ওহে শয়তান, তুই একটা সিজদা করলি না কেন? তুই একটা সিজদা করলে আজকের দুনিয়াতে এত ফিতনা হতো না'। এমনি সময় দেখলেন, তাঁর সামনে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি একটি মাটির উপর ভার করে তাঁর সামনে

এসে উপস্থিত। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ.) লোকটি কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে বৃদ্ধ, তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো?' বৃদ্ধ বললো, আপনি আমাকে স্মরণ করলেন, এজন্য আমি আপনার সামনে হাজির হলাম, আমি ইবলিশ।

তখন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ.) ইবলিশকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা তুমি বলো তো, আল্লাহ যখন তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আ.) কে সিজদা করার জন্য তখন তুমি কেন এ আদেশ পালন থেকে বিরত ছিলে এবং সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালে?' উত্তরে শয়তান বললো- হুজুর আপনি একজন বুজুর্গ ব্যক্তি, আপনার যুক্তিতে কি সমর্থন করলো যে আমি স্বয়ং স্রষ্টার সামনে একজন মাখলুক বা সৃষ্টকে সিজদা করি? শয়তানের উত্তর শুনে হযরত জুনাইদ বাগদাদী প্রথমে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। কি যে উত্তর দিবেন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর এসে গেল। তিনি বললেন-

ان كنت عبدا مامورا لما خرجت من امره ونحيه قال لقد احرقت بالله الخ

উচ্চারণ : ইন কুন্তা আব্দান মা-মূরান, লমা-খারাজতা মিন্ আমরিহি ওয়া নাহয়িহি, ক্বা-লা লাকাদ আহরাক্তা বিল্লাহ্।

অর্থাৎ 'তুমি যদি অনুগত বান্দা হতে, তবে নিশ্চয়ই তাঁর আদেশ-নিষেধের বাইরে যেতে না'।

উত্তর শুনে শয়তান বললো, 'আল্লাহর শপথ। আপনি আমাকে জ্বালিয়ে দিলেন।

বুঝা গেল, আনুগত্যের প্রশ্নে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে বুঝার ক্ষেত্রে, আল্লাহর নবী-রাসূলকে বুঝার ক্ষেত্রেই হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য।

আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-

افلا يتدبرون القران ام على قلوبهم اقفالها (الايه)

উচ্চারণ : আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনা আম আলা-কুলূবিহিম আক্বফালুহা।

অর্থাৎ 'তারা কি পবিত্র কুরআন চর্চা করতে পারে না? (তথা-কুরআনে আল্লাহর কুদরত সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করতে পারে না?) তাদের অন্তরে কি তালা লাগানো আছে?' অন্য আয়াতে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. والى السماء كيف رفعت. والى الجبال كيف نصبت. والى الارض كيف سطحت
(سورة غاشيه)

অর্থাৎ- 'তারা কি উষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কীভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?' (সূরা-ই-গা-শিয়া)

মহান রাব্বুল আলামীন এখানে তাঁর কুদরতের নিদর্শন নিয়ে গবেষণার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। এভাবে গবেষণা করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মনের মানুষ আলাদা আলাদা ধারায় এগিয়ে যাওয়ার পথ বেচে নিয়েছেন। আল্লাহর অলীগণও তাঁদের একটি অংশ। বরং তাঁরাই মূলস্রোতে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। মাইজভাণ্ডারী ধারার গজলগুলোতে ওই পথেরই দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আল্লামা বজলুল করীম মান্দাকিনী (রাহ.) বলেছেন-

'সৃষ্টির আড়ালে, গোপনে বসিয়া, বিদ্যুৎ খেলেছ অভিনয় ক্রিয়া,
জ্ঞানীগণে তোমার চাতুর্য্য দেখিয়া, হারায়ে বসেছে জ্ঞান।
মানব হৃদয়ে বাসস্থান রাখ, নর দৃষ্টি হতে বহু দূরে থাক,
চিনিতে না পারে, তাই তোমায় করে, অসংখ্য রূপেতে ধ্যান'।

বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন আশেক-ভক্তগণ, বিভিন্ন আরেফে কামেল আল্লাহর অলীগণ বিভিন্ন গজল রচনা করেছেন। আমাদের দেশের আলেম সমাজের কাছে সেগুলো অত্যন্ত সমাদৃত। কিন্তু দুঃখজনক, অজ্ঞাত কারণে বাংলা ভাষায় রচিত গজলকে অনেকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেন। হয়তো তা তাদের অজ্ঞতার বহি:প্রকাশ নতুবা স্বভাবসুলভ আচরণ। তবে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের রচিত মাইজভাণ্ডারী ধারার গজলগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বি বুজুর্গানে কেরামের গজল গুলোরেই ধারাবাহিকতা। যেখানে মহান আল্লাহর শান-মান, রাসূলেপাকের প্রতি ভালবাসা কাব্যাকারে সৃজিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আরেফে কামেল যার রচিত কিতাবাদি পুরো পৃথিবীতে, এমনকি ওহাবী-খারেজীরাও পাঠ্যভুক্ত রাখতে বাধ্য হয়েছে; সেই মহান

আশেকে রাসূল, মোল্লা শেখ আব্দুর রহমান জা'মী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি গজল লিখেছেন-

حسن خویش از روئے خوباں آشکارا کردۂ ☆ زانکہ برخود جلوۂ خود را تماشا کردۂ

উচ্চারণ :

হুসনে খাইশ্ আয্ রোয়ে খোবাঁ, আ-শকারা কর্দাঈ।
যাঁ-কে বরখোদ্ জল্ওয়ায়ে খোদ রা তামাশা কর্দাঈ।
পর্তভে হুসনত্ ন গুনজদ, দর যমীন ও আসমাঁ।
দর হারীমে সীনা হায়রানম, কেহ্ চুঁ জা কর্দাঈ ॥

অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! তুমি স্বীয় সৌন্দর্যকে এতই উচুমানে রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছ যা তোমার নুরানীয়ত বা আলোকময় সুন্দর বস্তুগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছো'।

'তোমার সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি আসমান যমীনের কোথাও কেউই ধারণশক্তি রাখে না। অতএব, আমি নিজেই দিশেহারা ও অবাক হই যে আমার এ ক্ষুদ্র অন্তরে কিভাবে স্থান করার তুমি ঘোষণা দিয়েছো'।

মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার ধারক ও বাহক পূর্ববর্তী আরেকজন আরেফ কামেল, আল্লামা শাহ আয়াতুল্লাহ হাসানী মুন'ঈমী আবুল উলায়ী (রাহ.), সিলসিলা-ই আবুল উলাইয়া'র দর্শন চেতনা বুঝার লক্ষ্যে লিখিত 'হুজ্জাতুল আরেফীন' কিতাবের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে মোল্লা আবদুর রহমান জা'মী (রাহ.) এর উল্লিখিত ফার্সি গজলগুলো পাঠ করা হলে হযরত কুতুবুল আলম, মাখদুম সৈয়দ মুন'ঈম পাকবাজ (রাহ.) এর ওয়াজদ ও হাল পয়দা হতো। এমনকি সে সময় তিনি বে খোদী অবস্থায় পৌঁছে যেতেন। ওয়াজদ ও হালের এ ধারা আবুল উলাইয়া সিলসিলার অন্যতম নক্ষত্র হযরত মুন'ঈম পাকবাজ (রাহ.), আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম (রাহ.), আল্লামা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মুতাওয়াক্কেল (রাহ.), হাজ্বীউল হারামাইন সৈয়দ লক্বীয়তুল্লাহ (রাহ.) এর ধারায় হযরত আল্লামা শাহ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী ও শাইখুল হাদীস আল্লামা সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ মুহাজেরে মাদানী (আলাইহিমুর রাহমা) এর মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রাণপুরুষ, শাইখুল হাদীস, গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ আহমদুল্লাহ আল কাদেরী (কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয) পর্যন্ত পৌঁছেছে। উল্লিখিত বুজুর্গদের ওয়াজদ ও হালের ধারা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ দরবারের খলিফা ও ভক্তবৃন্দ বাংলা ভাষায় অসংখ্য গজলাদি রচনা করেছেন। আল্লামা বজলুল করীম মান্দাকিনী প্রণীত এ গজলে তিনি 'সখা' বলতে আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টি হতে গোপনে অবস্থান করে নবী-অলীর মাধ্যমে তোমার কুদরতের যে রহস্যাবলী প্রকাশ করেছো তার মাধ্যমে তো তুমি আমাদের পাগল করেছো। শুধু আমরা নই, জ্ঞানে-গুণে যারা যুগশ্রেষ্ঠ তাঁরাও তোমার চাতুর্যের কাছে, তোমার কুদরতের কাছে বিভোর হয়েছে। তাঁরা তোমার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে, তোমাকে ধ্যান করতে গিয়ে, কখনো তোমার নৈকট্যধন্য হয়েছেন আর কখনো আত্মহারা হয়েছেন, যাঁদেরকে আমরা মজজুব বলে থাকি। তুমি নৈরাকার অবস্থা থেকে সৃষ্টিকে মোহিত করলে।

আল্লাহর কি রহস্য, তিনি মুমিনের হৃদয়ে অবস্থান করে তবুও তিনি নরদৃষ্টি হতে কত দূরে। আল্লাহর সৌন্দর্য বিভিন্ন বস্তুতে, তাঁর সৃষ্টিতে একেকভাবে প্রকাশ পেয়েছে যার ব্যাখ্যা দেওয়ার মত জ্ঞান মানবের নেই। তবুও গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লামা মান্দাকিনীর এ গজল আল্লামা রুমির গজলেরই অনুরূপ। এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মাওলানা রুমীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি-

من نگنجم در زمین و آسماں ☆ لیک گنجم در قلوب مومناں

উচ্চারণ: মন ন গুনজম্ দর যমীন ও আছমাঁ।
লে-কে গুনজম দর কুলুবে মু'মেনাঁ ॥

অর্থাৎ 'আসমান যমীনের কোথাও আমি আসীন হতে পারি না। কিন্তু মু'মিনদের অন্তরেই আসীন হয়ে থাকি'।

আল্লামা মান্দাকিনী তাঁর গজলে বয়ান করেন,

সূর্যের কিরণে, চন্দ্রের আলোকে নক্ষত্রের ঝলকে, পুষ্পের চটকে
জ্ঞান চক্ষু হেরি, গাহে কবিকুল, তোমারি মহিমা গান ॥
অঙ্গনার অঙ্গে, স্তন্যদ্বয় রঙ্গে, মধুর হাসিতে কটাক্ষেরি ভঙ্গে,

এ বিশ্ববাসীরে আকুল করিলে, হানিয়ে মদন বান ॥

আল্লামা মান্দাকিনী খোদার কুদরত তালাশ করতে গিয়ে সৃষ্টির যেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন সেদিকেই তিনি খোদার কুদরত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। সূর্যের কিরণের মাঝে, চন্দ্রের আলোর মাঝে, নক্ষত্রের ঝলকে কিংবা ফুলের সুগন্ধিতে খোদার কুদরত ছাড়া জ্ঞানচক্ষু আর কিছুই দেখে না।

আল্লামা মান্দাকিনীর উল্লিখিত গজলগুলো দরবারভক্ত লোকজনের সামনে পঠিত হলে তাদের অনেকের ওয়াজদ হয়ে থাকে। এটাও তরিকতের ইমামগণ ও সিলসিলার হযারাতে কেরামের ফয়েজ। 'হুজ্জাতুল আরেফীন (৪৮, ৪৯ পৃষ্ঠা) কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত খাজা শামসুদ্দীন শীরাযী প্রকাশ হাফিজ শীরাযী (রাহ.) রচিত 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' (৫৮ পৃষ্ঠা) এর নিম্নোক্ত কালামগুলি পড়লে হযরত কুতুবে আলম মখদুম মুন'ঈম পাকবাজ (রাহ.) এর ওয়াজদ হতো।

بلبلے برگ گلے خوش رنگ در منقار داشت ☆ واندراں برگ و نوا خوش نالہ ہائے زار داشت

گفتمش در عین وصل ایں نالہ و فریاد چیست ☆ گفت ما را جلوۂ معشوق دریں کار داشت

উচ্চারণ : 'বুলবুলে বুর্গে গুলে খোশরঙ্গ দর মিনক্বার দাশ্ত।
ওয়ান্দরাঁ বুর্গ ওয়া নওয়া খোশ্ না-লাহায়ে যার দাশ্ত ॥
গুফ্তমশ দর আইনে ওয়াচলে ঈঁ না-লা ওয়া ফরিয়াদ চীস্ত।
গুফ্ত মা-রা জলওয়ায়ে মা'শুক্বে দর ঈঁ কা-র দাশ্ত ॥'

অর্থাৎ 'একটি বুলবুলি ফুলের একটি সুন্দর পাপড়ি ঠোঁটে নিয়ে ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি করছিলো। আমি বললাম, যথাযথ মিলন মুহূর্তেই এ কান্না ও ফরিয়াদ করছে। তখন সে উত্তরে বললো, এটা (ফুলের পাপড়ি) তো প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের জ্যোতিরাশি। তাইতো আমাকে কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করতে বাধ্য করেছে'।

হযরত খাজা শামসুদ্দীন শীরাযী (রাহ.) ফুলের পাপড়িকে আল্লাহর কুদরত ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি আখ্যায়িত করেছেন। ফুলের পাপড়ির সাথে প্রেমাস্পদের (আল্লাহ) সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন। বুলবুলি যেভাবে ফুলের পাপড়ির সৌন্দর্যের খুশিতে আত্মহারা, তদ্রূপ খোদার প্রেমে আত্মহারা আউলিয়া-ই-কেরাম এসব সুন্দর বস্তুর উপর আল্লাহর কুদরত খুঁজে বেড়ান। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির প্রতিটি সৌন্দর্যের মাঝে আউলিয়া-ই-কেরাম খোদার সৌন্দর্য্যকেই দেখতে পান। গজলের মাধ্যমে তাঁরা এ মনোভাব প্রকাশ করেন এবং তা গাওয়া ও শ্রবণের মাঝে আত্মতৃপ্তি পান। তাঁরা এতে সুরে সুরে ঢোল-তবলা বা বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এটাকে 'সামা' বলে নামকরণ করা হয়, যা সিলসিলার হযারাতে কেরামদের ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডার শরীফ পর্যন্ত বর্তমানেও প্রচলিত আছে।

আল্লাহর নৈকট্যধন্য নবী-ওলীদের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত প্রকাশের আলোচনার এক পর্যায়ে আল্লামা মান্দাকিনী বলেন-

যুগে যুগে তুমি বিভিন্ন প্রদেশে, নবী অলি নামে মুনী ঋষি বেশে,
ঘোর অন্ধকার হতে এই মানবীকে, আলোকে টানিয়া আন ॥
তূর ফেলেস্টাইনে, দামেস্ক-মিশরে, মহাসমারোহে মদীনা নগরে,
বাগদাদ-আজমিরে পেয়েছি তোমারে, অপার করুণা দান ॥

উল্লিখিত চরণগুলির মর্মার্থ বিশাল সমুদ্র জলরাশিকে একটা ছোট্ট পাত্রে নিয়ে আসার মতোই। এ চরণগুলিতে বর্ণনাতীত ব্যাখ্যা রয়েছে যা স্বল্পপরিসরে ব্যাখ্যা করা কখনোই সম্ভব নয়। এটি অতি সংক্ষেপে মূল ভাবার্থ তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র।

যুগে যুগে আল্লাহপাক পথহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইমামুল আম্বীয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহপাক নব্যুয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেলায়তের দরজাকে প্রসারিত করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য গাউস, কুতুব, আবদাল পাঠিয়েছেন। আল্লামা মান্দাকিনী তার গজলে তূর পাহাড়ে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা ইঙ্গিত করেছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মাদিয়ান থেকে পরিবারসহ স্বদেশ (মিশর) অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ে পৌঁছালে তাঁর স্ত্রী হযরত সফুরা (আ.) এর প্রসব বেদনা শুরু হয়। তখন

আলোর জন্য নেহায়েত প্রয়োজন হল আগুনের। তিনি দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ একটি বিশাল গাছের অগ্রভাগে অগ্নিশিখা দেখলেন। হযরত মুসা (আ.) আশান্বিত হয়ে যতই সামনের দিকে যাচ্ছিলেন আগুন ততই পেছনের দিকে যাচ্ছিলো। এক পর্যায়ে হযরত মুসা (আ.) তার পরিবার থেকে পথ হারিয়ে ফেলেন। পথ হারিয়ে তিনি ডান দিকে চলতে চলতে একেবারে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ সবকিছুই ছিল খোদার এক মহাপরিকল্পনা।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন 'তূওয়া' উপত্যকায় দন্ডায়মান তখন ঐ গাছ থেকে আওয়াজ আসলো-

انی انا الله رب العالمین (الایہ)

উচ্চারণ : ইন্নি আনাল্লাহু রব্বুল আলামীন

অর্থাৎ- 'নিশ্চয়, আমি 'আল্লাহ', আমিই বিশ্বপালক'।

এছাড়াও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দেখার সুযোগ হয়নি। এভাবে আল্লামা মান্দাকিনী তূর পাহাড়ের বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত জাহির করেছেন। আবার তিনি ফিলিস্তিনের কথাও বর্ণনা করেন।

ফিলিস্তিনেও বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের বহু মুজেযা পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ, রাসূলে পাক (দ.) কে মেরাজ রজনীতে পবিত্র নগরী ফিলিস্তিনে গমন করিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে (দ.) মেরাজ রজনীতে পবিত্র মক্কা থেকে তো উর্ধ্বে সরাসরি আরশে আযীমে নিয়ে যেতে পারতেন। তিনি তাঁর হাবীবকে ওই সময় সুদূর বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ফেরার সময়ও সেদিক হয়ে ফিরিয়ে আনলেন। এতে যে রহস্য লুকায়িত আছে তা বুঝা খুবই কঠিনসাধ্য বিষয়। পথিমধ্যে প্রিয় রাসূলকে (দ.) যেসব পূণ্যময় নিদর্শন দেখিয়েছেন, সবই আল্লাহর কুদরতের রহস্যময় কর্মকান্ড। যাওয়ার পথে মুজাহিদদের সওয়াব, পাপিদের সাজা, হযরত মুসা (আ.) এর কবর ও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার দৃশ্য, হুজুর করীম (দ.) এর রওজা শরীফের স্থান, হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ ও তাঁর আওলাদগণের মাহাত্ম্য, হযরত ঈসা (আ.) এর বেলাদতগাহ (জন্মস্থান) ইত্যাদি দেখানোর পর আবার তাঁদেরকেই বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত দেখানো আল্লাহর কুদরতের গুপ্ত রহস্য ছাড়া আর কী হতে পারে? দামেস্ক ও মিসরসহ বিভিন্ন দেশে দেশে আল্লাহ তুমি বিবিধ পন্থায় আত্মপ্রকাশ করেছো। দামেস্কে অনেক নবীর আগমন ঘটেছে। আসহাবে কাহাফের ঘটনা, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে মানব আকারে ফেরেস্তাদের আগমন, তাঁর উপর বিভিন্ন পরীক্ষাসহ অসংখ্য ঘটনা দামেস্কে ঘটেছে। মিসরে হযরত ইউসূফ (আ.) এর ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট সুন্দর বিবরণ দিয়েছে। এসব স্থানে অলৌকিক ঘটনা ও নবুয়্যতের রহস্যভরা বিষয়াদি প্রকাশ করার পর সর্বশেষ মদীনা-ই-মুনাওয়ারায় তোমার রাসূল সাইয়্যেদে কুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কুদরতের যে শান প্রকাশ করেছো তা শুধু মানবজাতি নয়, সৃষ্টিকুলের কারো পক্ষেই বুঝা সম্ভব নয়। নবুয়্যতের পর্ব শেষে, তোমার নৈকট্যধন্য প্রিয় বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেরামের অসংখ্য অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছো। বিশেষ করে, বাগদাদ শরীফে গাউসুলআজম জিলানীর মাধ্যমে ও আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের মাধ্যমে অনেক কিছুই ঘটিয়েছো। আমরা হয়তো তার খানিকটা অনুধাবন করতে পেরেই নিজেদের ধন্য বলে আত্মতুষ্টি প্রকাশ করছি যে এটুকুই আমাদের জন্য তোমার অপার করুণা দান।

সর্বশেষে, গাউসে বাগদাদ ও খাজা আজমিরী উভয় ধারার মিলনক্ষেত্র হিসেবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রাণপুরুষ, হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী ও হযরত বাবাভাণ্ডারীসহ সিলসিলার বুজুর্গানে দ্বীনের বুজুর্গীতে আমরা অশেষ খুশী প্রকাশ করে আল্লাহর প্রশংসা কীর্ত্তন করে বেড়াচ্ছি। আমাদের মত হতভাগাদের জন্য তোমার এ সিলসিলা সত্যিই তোমার এক দুর্লভ নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য আল্লামা মান্দাকিনী বলছেন-

'মাইজভাণ্ডার সিংহাসন অলংকৃত, করেছো দেখিয়ে হয়ে আনন্দিত,
প্রশংসা কীর্ত্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান ॥

মাহে রমজান : কোরআন নাজিল, তাক্বওয়া অর্জন জিহাদ ও বিজয়ের মাস

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

পবিত্র রমজানুল মুবারক মুসলিম সমাজে অতি পবিত্র ও মহিমান্বিত মাস বলে স্বীকৃত। এ মাসের এতো মাহাত্ম্য ও মর্যাদার পেছনে বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধানকারণ হলো- এ মাসে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের হেদায়তের জন্য নাযিল হয় 'আল-কোরআন'। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 'রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সত্য পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে'।

তেমনি এ মাসে সংঘটিত দু'টি ঐতিহাসিক বিজয় বদরের বিজয় ও মক্কা বিজয়। সুতরাং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাস যেমন মাহে রমজান, তেমনি আল্লাহ-রসূল ও ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাসও মাহে রমজান।

প্রতিটি মানুষের পেছনে যে দু'টি সর্বদা লেগে আছে, তাদের মধ্যে একটি জ্বীন-শয়তান, অপরটি ইনসান (মানুষরুপী) শয়তান। (হাদীস)

এ জ্বীন-শয়তান মানবের দেহ অভ্যন্তরে সর্বদা 'ওয়াছওয়াছা' বা পাপ কার্যের প্ররোচনা দেয়। আর মানুষরূপী শয়তান 'মানুষের দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন। বিধায় সে মানুষের বাহ্যিক অঙ্গনে নির্যাতন করে, প্ররোচনা দেয়, ভয় দেখায়। এ দু'শত্রুকে পরাজিত করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে, তেমনি বাইরের শত্রুকেও পরাভূত করে প্রতিষ্ঠা করবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা। তাই এ উভয়বিধ শত্রুকে পরাভূত করার মাঝেই মুসলমানদের বিজয় নিহিত। আফসোস! মুসলিম সম্প্রদায় আজ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ছেড়ে দিয়ে প্রবৃত্তির দাস সেজে তরবারী হাতে নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের ডাক দেয়, কাফের শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে মুজাহিদের কাতারে আহ্বান করে, আবার কেউ মসজিদ ও খানকাহ্ গড়ে পাগড়ী ও তসবীহ হাতে নিয়ে আল্লাহ-আল্লাহ জিকিরে আত্মশুদ্ধিতে মশগুল। বাইরের দুনিয়ার তাদের খোজখবর নেই। বিশ্ব মুসলমানদের দুঃখ, দুর্দশা ও নির্যাতন তাদের মনকে নাড়া দেয় না। তাই আজকের মুসলমানদের একদিকে আত্মশুদ্ধির যেমন প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে ইসলামকে যারা নির্মূল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে 'জিহাদে' অবতীর্ণ হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনা আবশ্যক। তাইতো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনাদর্শে দেখতে পাই- সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অনুশীলন করার সাথে সাথে বদর ও মক্কা বিজয়ে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ের সূর্য ছিনিয়ে আনে। তাই আজকেও আমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করে 'তাকওয়া' গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক। অপরদিকে বদর বিজয় ও মক্কা বিজয়ের ঘটনা স্মরণ করে সে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। কোরআন নাজিলের আনন্দ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে বিজয়ের আনন্দ, বদর ও মক্কা বিজয় তথা ইসলামের দুশমনদের ওপর ইসলামী শক্তির বিজয়ের আনন্দ। এ তিন আনন্দের সম্মিলিত রূপ নিয়ে যদি মহাখুশির 'ঈদুল ফিতর' উদ্‌যাপন করা যায় তবেই সে ঈদ হতে পারে মুসলিম বিশ্বের জন্য সত্যিকারের ঈদ। অন্যথায় প্রবৃত্তির দাস, নফসের গোলাম, পাপাচার-কামাচার, হত্যা, লুট ও ডাকাতিতে লিপ্ত, আত্মমর্যাদা বিস্মৃত একটি জাতি, যার এক বিপুল

অংশঅস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্মুখীন এবং যে জাতির লাখ লাখ নরনারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার আর্তচিৎকারে আসমান-জমিন কাঁদছে। হাজার হাজার অসহায় মা-বোন নরপশুদের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছে, অগণিত নিরাপরাধ লোক বুলেটের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, জমিনের ওপর তাদের রক্তের বন্যা বইছে আর অন্যদিকে মুসলিম আমীর, শেখ, শাহজাদাদের বিলাস দুনিয়ার সব বিলাসিতার রেকর্ড ভঙ্গ করছে। মুসলিম দুনিয়ার কঙ্কালসার মানুষের মরণ মিছিলের ভেতর দিয়ে যে রমজান এল, যে ঈদ আসছে, আর আমরা তা যেভাবে উদযাপন করছি তার মধ্যে রুহানিয়াতের চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাই যে বেশি রমজানের সত্যিকার আহ্বান আমাদের জীবনে যে ব্যর্থতা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। এমন সিয়াম সাধনা ও ঈদ উদযাপনে কোন সার্থকতা ও কল্যাণ বয়ে আনবে না, যতক্ষণ না আমরা ভেতরে ও বাইরে উভয় প্রকার শত্রুর মোকাবিলা করে আত্মশুদ্ধি ও বিজয় অর্জন না করি।

উপরেই উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র রমজানুল মুবারক যে তিনটি বিশেষত্ব যেমন- কোরআন অবতীর্ণ, তাক্বওয়া অর্জন, প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হওয়া নিয়ে আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত হয়েছে। এ তিনটি দিক সম্পর্ক সচেতন হলে আজও জাতির অতীতে গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। নিম্নে এ তিনটি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হলো।

কোরআন নাজিল : যুগে যুগে, কালে কালে, মানব জাতির হেদায়তের জন্য নবী-রসূলগণের আগমন হয়েছে এ পৃথিবীতে। নবুয়ত ও রেসালতের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওপর অবতীর্ণ করেন কিতাব বা ছহীফাহ। এ কিতাব বা ছহীফাহ্ হলো আল্লাহর আদেশ নিষেধের নিখুঁতরূপ। নবী ও রাসূলগণ এ কিতাবের বর্ণিত বিধান মতে ফায়সালা করে থাকেন। নবী-রাসূলদের তিরোধানের পর শুভ অনুসারীরা তাঁদের রেখে যাওয়া কিতাবের বিধান মতো চলে। যখনই তারা এ নবী-রাসূলদের দেয়া বিধান কিতাবের অনুসরণ করে ততো দিন তাদের মাথায় থাকে সম্মান ও মর্যাদার গৌরবের মুকুট। তারাই দেয় বিশ্ব নেতৃত্ব। কিন্তু যখনই তারা এ নেয়ামতের অস্বীকার করে বসে, নবী-রাসূলদের দেয়া বিধান মতো না চলে নিজ খেয়াল-খুশি মতো চলে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা ও নেতৃত্বের মুকুট ছিনিয়ে নেয়, আজাব-গজবে নিপতিত হয়ে তারা কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। ইতিহাসে এমন নজির কম নয়।

এভাবে বহু কাল-যুগ পেরিয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল কোরআন নাজিল হলো সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, রাসূল ও নবীগণের সরদার আকায়ে মাওলা নবী হুজুর সৈয়্যদে আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপরে এবং এ কিতাব মতে অভ্যুদয় ঘটলো এক নতুন জাতির। তাদের নাম মুসলমান। দিন দিন অজানা অচেনা এ জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলো। শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এ জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলো। শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এ জাতি অর্ধ দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। আরব রাজ্য সীমানা পেরিয়ে নীল নদ, দক্ষিণ চীন রাজ্যের কাশগড়ে এসে এ জোয়ারের ধাক্কা এসে লাগলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে রাখল এক অবিস্মরণীয় অবদান। জন্ম নিল এক বিশ্বজনীন সভ্যতার। বস্তুত এ মুসলিম জাতি যতদিন কোরআন এর বিধান আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছিল ততোদিন তাঁরা মান-সম্মান মর্যাদার আসনে আসীন ছিলো। তাদের শিরে ছিল নেতৃত্বের মুকুট। কিন্তু যখনই এ জাতি কোরআন এর আদর্শ ছেড়ে দিল তখনই নেমে এলো খোদায়ী অভিশাপ। যাবতীয় নির্যাতনের শিকার হলো তারা। এটাই খোদায়ী বিধান যে- 'যখন যে জাতি তার নেয়ামতে না শোকরী শুরু করে তখন সে জাতির ওপর থেকে তুলে নেয় তার রহমত ও বরকত'। তাইতো ইকবালের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে-

'ওহ্ যমানে মে মুয়াজ্জজ থে মুসলমান হো কর
আওর তোম খার হোয়ে তারেকে কোরআন হো কর।'

অর্থাৎ আগেকার মুসলমানরা কোরআনী আদর্শে আদর্শবান ছিল বলেই মর্যাদার আসনে আসীন ছিল। আর কোরআনী বিধান ছেড়ে দেয়াটাই তোমাদের

লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ।

সুতরাং 'কোরআন' নাজিলের মাসে কোরআনকে শুধু কর্ণশ্রুত করলে চলবে না, বরং নতুনভাবে এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে, মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে- একমাত্র 'কোরআন' এর পথেই আমাদের উন্নতি, সমৃদ্ধি, মর্যাদা ও গৌরব নিহীত। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের গ্যারান্টি নিহীত-একে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই কোন তন্ত্রমন্ত্র নয়, একমাত্র ইসলাম। কোন সংবিধান নয়- একমাত্র কোরআন। কোন নেতার আদর্শ নয়- একমাত্র প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কো, লন্ডন, বেইজিং, টোকিও নয়- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মদীনাই হচ্ছে এ উম্মাহর শক্তির উৎস ও প্রেরণার কেন্দ্রভূমি। এ উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তনই আমাদের মুক্তি। এ মুক্তি অর্জনই সিয়াম সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া চাই।

যে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ওপর এ পবিত্র মাসে 'কোরআন' অবতীর্ণ করেছেন, সে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা কোরআনকে ব্যবহার না করে, বরং এ গৌণ কতগুলো কাজে কোরআন ব্যবহার করছি। কোরআনের আলোকে আমাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত করতে পারলে, কোরআনী বিধান আমাদের সমাজ দেহে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই কোরআন নাজিলের সার্থকতা আমাদের মাঝে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আলেম ওলামাকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

তাক্বওয়া অর্জন :

সিয়াম আদায়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে আর একটি হলো- 'তাক্বওয়া' গুণ অর্জন করা। 'তাক্বওয়া' অর্জন ছাড়া একজন 'ইনসানে কামিল' হওয়া অসম্ভব। আর 'তাক্বওয়া' গুণে যিনি বিভূষিত তিনিই 'মুত্তাকী'। 'মুত্তাকী' হওয়া গেলেই কোরআন তাকে পথপ্রদর্শন করবে। অন্যথায় শতবার কোরআন পড়লে, কোরআনী শাসন চাই বলে হা-হুতাস করলেও কোন কাজ দেবে না। যেমন এ প্রসঙ্গে বিবৃত হচ্ছে-'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' বা এ কোরআন মুত্তাক্বীনদের জন্য পথপ্রদর্শক।

সুতরাং জানতে হবে 'তাক্বওয়া' কী? 'তাক্বওয়া' অর্থ বেঁচে থাকার নাম। পরিভাষায় 'তাক্বওয়ার' অনেক সংজ্ঞা আমরা দেখি। সব সংজ্ঞা বাদ দিয়ে এক কথায় বলতে হয়- আল্লাহর ভয় আর প্রেম এ দুয়ের সম্মিলিত এক বিশেষ অনুভূতির নামই হচ্ছে 'তাক্বওয়া'। আল্লাহর ভয়ে কম্পমান ও সাথে সাথে তাঁর প্রেমে আত্মহারা ব্যক্তিরাই পারে সব ভয় ও প্রলোভন জয় করতে। আর এ দু'টি জয় করতে পারে যারা তারা অজেয় হবে সকল শক্তির কাছে। আমাদের কাছে 'রমজান' আসে আর যায় কিন্তু এ 'তাক্বওয়া' গুণে আমরা গুণান্বিত হতে কতদূর পেরেছি? সে 'তাক্বওয়া' গুণও নেই আর সেই আধ্যাত্মিক শক্তিও নেই। তাইতো 'ইকবাল' কণ্ঠে বিঘোষিত হচ্ছে-

ওয়ায়েজে কওম কি ওয়হ্ পুখতা খেয়ালী না রহী
বরকে তবয়ী না রহী শো'লা মকালী না রহী'

'তোমার জাতির উপদেশকের জ্ঞান-পক্বতা নাহিক আজ
নাই আর সেই বাণীর দীপ্তি, উষ্ণতা নাই- হৃদয় মাঝ' ॥

তাই 'তাক্বওয়ার' আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের চরিত্রবান এক গোষ্ঠী তৈরির সংগ্রামেই সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করা দরকার। রমজানুল মুবারক সেই আহ্বান নিয়েই এসেছে। এ 'তাক্বওয়া' গুণে গুণান্বিত হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারলেই বদর ও মক্কা বিজয়ের মত ঐতিহাসিক বিজয় আজও আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবে।

সিয়াম সাধনা মানুষকে 'মুত্তাকী' করার পথে তার মধ্যে যে সব মহৎ গুণের সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ পালনে আগ্রহ বৃদ্ধি, পাপকাজে অনাসক্তি, মানুষের প্রতি বিশেষ করে ক্ষুধার্ত ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি, সাম্য ও মৈত্রীবোধ, সংযম, ন্যায়-পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সালাত ও কোরআন তিলাওয়াতে একাগ্রতা ইত্যাদি মহৎ গুণ যখন একজন সিয়াম পালনকারীর অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে

পরিণত হয়ে যাবে, সেই হবে সত্যিকার মুত্তাকি এবং সাবধানি জীবনের অধিকারী। আর এ সাবধানি জীবনের অধিকারীদের সংখ্যা সমাজে যেদিন বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের প্রভাব ও নীতি আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিনই সমাজে স্থাপিত হতে পারবে ইপ্সিত শান্তি। আমাদের জাতীয় জীবনের বহুবিধ সমস্যা ও অশান্তি, অস্থিরতা ও ব্যয় বহুলতার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের জাতীয় চরিত্রে তাক্বওয়ার গুণ সৃষ্টি করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

বিজয়ের মাস : দু'টি মহা বিজয়কে ধরে রেখেছে এ পবিত্র মাস রমজানুল মুবারক। একটি বদর বিজয় অপরটি মক্কা বিজয়। মাহে রমজান মুসলিম মিল্লাতের দ্বারে উপস্থিত হয়ে এ দু'বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিবছর, প্রতিটি মুসলমানকে। তবুও তাদের মর্মমূলে এ বিজয় কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাই বর্তমান নির্যাতিত মুসলিম মিল্লাতের মুক্তি ও উত্তোরণ এবং হারানো গৌরব ফিরে পেতে রমজানে সংঘটিত এ দু'টি বিজয়ে নানা মাল-মসলা রয়েছে।

যারা আমেরিকা, ইউরোপ এবং তথা বহুজাতিক বাহিনীর বুলেট, মিসাইল, সৈন্যসামন্তের ভয়ে সর্বদা কম্পমান। তাদেরকে জানা উচিত যে, ১৭ই রমজানের সংঘটিত বদর বিজয় সংখ্যাধিক্য কিংবা অস্ত্রের বলে হয়নি।

নানা অত্যাচার, উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে পৌছলেন। সাহাবীরাও ধীরে ধীরে মদিনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হলেন। মদিনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনযোগ দিলেন। এরইমধ্যে প্রায় দু'বছর কেটে গেলো। মদিনার প্রতিপত্তি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 'মদিনাতুর রাসূল' তৎকালীন বড় বড় প্রতাপশালী রাজা বাদশাদের মনে তাক লাগিয়ে দিলো। এ সবকিছু মক্কাবাসী জালিমদের সহ্য হলো না। মুসলমানরা সব ছেড়ে মদিনায় হিজরত করাতেও থামেনি কাফেরদের আক্রোশ। দেশ ত্যাগ করে যেখানে আশ্রয় নিয়েছে অবশেষে সেই মদিনার ওপর হামলা চালাতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। মুসলমানরা আর কতো কাল নীরবে সহ্য করবে অত্যাচার। জালিমকে কেবল জুলুম চালিয়ে যেতে দেয়াও অন্যায়। অন্যায়কে মুখ বুঝে সহ্য করে যাওয়া কাপুরুষতা। জাগ্রত জীবনের এ লক্ষণ নয়। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আছে জিহাদেরও। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যই অন্যায়কে করতে হবে নির্মূল। তাইতো এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন জিহাদের। তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ-সামগ্রীতে ভরপুর এক হাজার কোরেশী বীরের সাথে তিনশ'তের জন সাহাবী, নামে মাত্র দু'একটি অস্ত্র নিয়ে আল্লাহু আকবর এর ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে মহাবিজয় বদর প্রান্তে অর্জন করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির পাওয়া একেবারে মুশকিল।

এ বদর বিজয়ের লেশ ধরে অষ্টম হিজরীতে রমজান মাসে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিলো। আর এ মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার মিশন পৌছিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণতায়। সেইদিনই মক্কার চত্বরকে পাক করা হলো যেখানে অসংখ্য অলীক দেবদেবীর অর্চনা করা হত। সেই সত্যের সমাগমনে অসত্য বিদূরিত হলো। চারদিকে ইসলামের শুধু জয় জয়কার ধ্বনিই উচ্চারিত হতে লাগলো। মুসলিম যোদ্ধারা তাদের বিজয়ের ঘোড়া হাকিয়ে নীলনদের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে চললো। চারিদিকে মুসলমানদের বিজয় আর বিজয়। ইকবালের ভাষায়-

'শুধু মাঠ আর ধূ ধূ ময়দান নয়; সমুদ্রগুলোকেও আমরা (মুসলমানরা) ছাড়িনি, সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরেও আমরা বিজয়ের গোড়া নামিয়ে দিয়েছি।'

কিন্তু আজকের মুসলিম জাতি ঐ গৌরবময় যোগ্যতা কি অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে? অথচ আগেকার মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই পদার্পণ করেছে সেখানেই তারা এনেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরেরা সেই সমৃদ্ধি ও গৌরবকে ধরে

রাখতে পারেনি বলে তো আজ আমরা কাফের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছি।

ইসলাম ফিতরাত বা স্বভাবের ধর্ম। তাই সে প্রবৃত্তিকে গলাটিপে হত্যা করতে বলে না বরং এর শুদ্ধি ও এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বলে। কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু মানুষকে আল্লাহ দান করেননি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য কোনটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। একে নির্মূল নয়, শুদ্ধির প্রয়োজন। যথাযথ ব্যবহারের প্রয়োজন। ব্যবহারের ওপরই বস্তুর ভালমন্দ নির্ভর করে। তাই ইসলাম সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, জীবনের ধর্ম। তাইতো খোদায়ী বিধান হলো- জালিমকে বাধা দাও, মজলুমকে সাহায্য করো, প্রয়োজনবোধে হাতে অস্ত্র তুলে নাও, আবশ্যক হলে মার অথবা মর। তবুও অন্যায়ের কাছে শির নত করো না। বাতিলের সাথে হাত মিলিও না।

রমজান যেমন সংযমের পয়গাম নিয়ে আসে, তেমনি আসে সংগ্রামেরও পয়গাম নিয়ে। স্মরণ করিয়ে দেয় বদরের কথা। ফতেহ মক্কার কথা, জিহাদের কথা। তাই রমজান যে 'তাক্বওয়া' অর্জন করার ডাক দেয় তা সন্ন্যাসী ও বৈরাগী বানানোর জন্য নয় বরং মুজাহিদ বানানোর জন্য। এ জন্যই মাহে রমজান ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাস, ইসলামের বিজয়ের মাস। রমজান শুধু রকমারি ইফতার ও সাহরী নিয়ে আসেনি বরং আমাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অবিস্মরণীয় বার্তা নিয়েই আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়। কোরআন অবতরণ, বদর বিজয়, মক্কা বিজয় ও আত্মশুদ্ধির এ বরকতময় মাসে বিশ্ব মুসলিমকে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যেমন জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে, তেমনি ইসলামের পথ রোধকারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ পৃথিবীতে আমাদের আগমনের মূল কারণ হলো- ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিহত করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রমজানের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করে, সে মতে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন। বেহুরমতে নবীয়্যিল আমীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

প্রাণে খোঁজে মাইজভাণ্ডার

[মাইজভাণ্ডারী গীতি কবিতা]

মাইজভাণ্ডারীর দয়ার খনি দেলা ময়না হোসাইনী

-টিপু বড়ুয়া-

গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী
আহমদ উল্লাহ (ক.) আওলাদে রসুল
ত্রিজগতের সোলতান, নবাব দেলাওর হোসাইন
জজ্বা হালে হযরত কেবলা করে গেছেন বয়ান ॥
দেলা ময়না মাইজভাণ্ডারী গাউছেপাকের নয়নমনি
গাউছের ধন দান করিলেন
পাক দরবারের নূরের খনি
বেলায়তে গুণে ধনী দেলা বাবাজান,
গাউছেপাকের গাউছিয়তের অমর আজব শান ॥
প্রাণের ময়না গাউছেপাকের নয়নের জ্যোতি,
মাইজভাণ্ডারে ময়নাহীনে পায় না দয়ার দ্যুতি
মূল না চিনে প্রেম বাগানে কাঁদেন সারা জীবন,
মওলার দর্শন পাবে না তো পণ্ড হবে সাধন ॥
দেলা বাবা গাউছেপাকের প্রেমবাগানের মূল,
ময়না বীণে গাউছেপাকের পায়না চরণ ধুল ॥
গাউছেপাকের দয়া পেতে ময়নার দ্বারে যাও,
ময়না ছাড়া গাউছে ধনতো
রাজি নন তা জেনে নাও ॥
দেলা বাবার দৃষ্টি পেলে গাউছেপাকের পাবে মন
গাউছেপাকের দয়ার দানে পূর্ণ হবে সব সাধন
না বুঝিয়া না চিনিয়া ভিন্ন পথে গেলে
সাধন ভজন ধন দৌলত সবই বিফলে।
এই কারণে বলে গেছেন জ্ঞানী গুণীজন
গাউছে মাইজভাণ্ডারীর দয়ার খনি
দেলা ময়না হোসাইনী ॥

শবে কদর : মর্যাদা বৃদ্ধির রাত

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী

[লেখকের রুহে মাগফিরাত কামনার মাধ্যমে তাঁর নিবেদিত খেদমতের স্মৃতির স্মরণে এই লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউছ নছিব করুন। - নির্বাহী সম্পাদক]

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি উম্মতে মুহাম্মদী (দ.) এর জন্য লাইলাতুল কদর (সম্মানিত রাত) দান করেছেন। লাইলাতুল কদরকে কদর কেন বলা হয়? কদর অর্থ সম্মান, মর্যাদা প্রভৃতি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'পরবর্তী এক বছরের নির্ধারিত বিধিলিপির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণকে হস্তান্তর করা হয় বলে এ রাতকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়।' অর্থাৎ শবে বরাত (লাইলাতুল মোবারাকা) মানবজাতির জন্য ভাগ্যলিপি (বাজেট) নির্ধারিত হয়। সেটার কার্যকারিতার জন্য লাইলাতুল কদরে দায়িত্ববান ফেরেস্তাদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে। আবার অনেক মুফাস্সির ও মুহাদ্দেসিনদের মতে কদরের রাতে পবিত্র কোরআন শরীফ নাজিল করা হয় বলে এ রাতকে কোরআনের সম্মানে লাইলাতুল কদর বলা হয়। উপরোক্ত দুটি বিষয়ের প্রতি জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মতামত প্রকাশ করলেও মূলত আরও একটি কারণ থেকে যায়। তা হচ্ছে- একদা সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দ.) এর নিকট পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের এবাদত-রেয়াজত সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আল্লাহর নবী (দ.) বনী ইসরাইলের একজন নেক্কার বান্দার কথা উদাহরণ স্বরূপ বললেন, ওই নেক্কার ব্যক্তি একহাজার মাস আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদে মশগুল থাকেন। সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারব না। আমাদের হায়াত তো সীমিত। আল্লাহর নবী (দ.) চিন্তিত হলেন। শ্রেষ্ঠ নবীকে শ্রেষ্ঠ কিতাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগ হওয়ার কারণে উম্মতের হায়াত সুদীর্ঘ নয়। তাই এবাদত-রেয়াজতে ব্যাপকতা কিভাবে অর্জিত হবে? সাহাবায়ে কেরামের এই অনুভূতিজনিত কথা মহান আল্লাহপাকের অজানা ছিল না। তিনি এবাদত রেয়াজতে উম্মতে মুহাম্মদী (দ.) কে শ্রেষ্ঠ করতে মনস্থ করলেন। তিনি পবিত্র কোরআনে পাকে ইরশাদ করলেন, 'লাইলাতুল ক্বাদরে খায়রুম মিন আলফি শাহরিন' অর্থাৎ কদরের রাত হাজার মাসের রাত হতেও উত্তম। সুবহানাল্লাহ। বুঝা গেল, এ রাতে কোরআন শরীফ নাজিল করে ও এ রাতে ফেরেস্তাদেরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করে যেমন এ রাতকে সম্মানিত করেছেন। অনুরূপভাবে সীমিত হায়াতের অধিকারী উম্মতে মুহাম্মদীকে এক রাতের নফল এবাদতের বিনিময়ে এক হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদত বন্দেগী কবুল করার মাধ্যমে আল্লাহপাক আখেরি জামানার বান্দাদেরকেই সম্মানিত করেছেন। ওই নেক্কার বান্দা আল্লাহর দরবারে এক হাজার মাস রেয়াজত করেছেন। তাই উম্মতে মুহাম্মদীকেও রেয়াজত হেতু রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত গুলোতে শবে কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র শবে কদর রাত পেয়ে গেলেই মুক্তির চিন্তা না করে বরং শবে কদরের তালাশে অধিক রাত সমূহে এবাদত করে সর্বাধিক বুজুর্গী হাসিল করতে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা কেবলমাত্র সাতাশ রমজানে শবে কদরের বন্দেগী করে ক্ষান্ত হন, তাদের তুলনায় সেই সব আল্লাহপ্রেমিক বান্দারাই বেশি উপকৃত, যারা শবে কদরের তালাশে সব কয়টি বেজোড় রাত সমূহে (২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯) এবাদত বন্দেগী করে আল্লাহর নিকট অধিক

সম্মানিত হতে চেষ্টা করেন। তাই হক্কানী রব্বানী আলেম-ওলামারা প্রতি বেজোড় রাত সমূহে অন্তত বার রাকাত শবে কদরের নফল নামায পড়তে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

'খাজেন' কিতাবে বর্ণিত যে, শবে কদর রাতের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এ রাতে এত বেশি ফেরেশতা নাযিল হয়, যাতে পৃথিবীর জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। পৃথিবীতে আসমানী ফেরেশতাদের ধারণ ক্ষমতা থাকে না। ফেরেশতাগণ উম্মতে মুহাম্মদীকে মোবারকবাদ জানাতে নাজিল হয়। আখেরি জামানার উম্মতদের হায়াত অল্প হলেও তাদের ওপর আল্লাহ বড় মেহেরবান। আল্লাহপাক তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহর প্রিয় হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামিনের উসিলায়। তাই ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানান। আল্লাহর নবী (দ.)ও কখনো উম্মতদের প্রতি বদদোয়া কামনা করেন নাই। হাশর ময়দানে বেহেস্তে প্রবেশের জন্য সকল নবীদের উম্মতগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আগে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে উম্মতে মুহাম্মদী (দ.)। কেউ কেউ প্রশ্ন করে তা কিরূপে সম্ভব? আগের নবীদের উম্মত আগে প্রবেশ করাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আল্লাহপাক উম্মতে মুহাম্মদীকে শবে কদর দান করে কেবলমাত্র দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন তাই নয়। তিনি নবী মোস্তফা (দ.) এর সম্মানে উম্মতে মুহাম্মদিকে হাশর ময়দানেও সম্মানিত করবেন। সামরিক কায়দায় ঘোষিত হলে (About Turn) উল্টো ঘুর। এতে সামনের সারি পিছনে পড়বে। পিছনের সারি সম্মুখীন হবে। এখানেও ফেরেশতাগণ উম্মতে মুহাম্মদিকে মোবারকবাদ জানাবে। অন্য নবীদের উম্মতগণ এতে বিস্মিত হলে ফেরেশতাগণ এলান করবে, এরা তো সেই উম্মতগণ, যাদের দলে অন্তর্ভূক্ত হতে নবীদের আগ্রহ প্রকাশ পেত। তারা শবে বরাত, শবে কদর, শবে মে'রাজ, শবে আশুরা, শবে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শবে ঈদুল ফিতর, শবে ঈদুল আযহা, শবে রজবে আওয়াল, শবে জুমাতুল বিদা, শবে ইয়াউমুল জুমা প্রভৃতি রাত সমূহে নফল এবাদত বন্দেগীকারী মুসলমান। তাদেরকে 'গার্ড অব অনার' প্রদানের জন্য একদল সম্মানিত ফেরেশতাকে আল্লাহপাক মজুদ রেখেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে 'ওয়াসিক্বাল লাজিনাত তাকাও রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা। হাত্তা ইযা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদীন। (সুরা যুমার, আয়াত-৭৩)

অর্থাৎ এবং যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করতো তাদের যানবাহনগুলো দলে দলে জান্নাতের দিকে চালিত হবে। শেষ পর্যন্ত যখন সেখানে পৌছবে এবং সেটার দ্বার সমূহ উন্মুক্ত থাকবে এবং সেটার দারোগা তাদেরকে সালাম জানাবে। বলবে- তোমরা সুখে থাক। সুতরাং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে জান্নাতে (বেহেশতে) প্রবেশ কর। সুবহানাল্লাহ!

উম্মতে মুহাম্মদী (দ.) তো এমন এক নবীর উম্মত (অনুসারী)। যাকে 'সুবহানাল্লাযী আস্‌রা বিআবদিহী----' বলে আরশে আজিমে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরা তো সেই নবীর শুভ আবির্ভাবে খুশির জুলুস করেছিল (ফাল ইয়াফরাহু)। আজকে সেই নবীর স্থান আল্লাহর অত্যধিক নিকটে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থানে) 'হাযা মিন ফাদ্বলে রাব্বী' ইহা আমার প্রভুর একান্ত অনুগ্রহ। সুবহানাল্লাহ! ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি (রা.) উল্লেখ করেন যে, নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন, 'এ মর্যাদাবান রাত (শবে কদর) আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র আমার উম্মতদেরকে দান করেছেন। আমার পূর্বে কাউকে দান করা হয়নি।' সুবহানাল্লাহ! ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত যে, নবী করিম (দ.) বলতেন, 'তোমাদের নিকট এমন একটি মাস উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত রয়েছে, সে সত্যিই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি শবে কদর রাতে সওয়াবের নিয়তে ইবাদতে দন্ডায়মান থাকে তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ

মাফ করে দেয়া হয়।' সুবহানাল্লাহ!

ইমাম মালেক বিন আনাস (রা.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.) ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রা.) এর মতে, লাইলাতুল কদর কখনো নির্দিষ্ট এক তারিখে হয় না। রমজানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাত সমূহে লুকায়িত থাকে। বোখারী শরীফে হযরত মা আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা শবে কদরকে রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত সমূহে তালাশ কর।' হযরত ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, লাইলাতুল কদর একুশতম রজনীতে হানাফী মজহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা.) বলেন, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাতে। তাফসীরে কবিরে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে কা'ব (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাতে। যেহেতু 'লাইলাতুল কদর' শব্দদ্বয়ে নয়টি বর্ণ আছে এবং 'লাইলাতুল কদর' শব্দদ্বয় আয়াতে তিনবার এসেছে। যার সমষ্টি হয় সাতাশ (৯X৩=২৭) তাই শবে কদর সাতাশে রমজান। বুঝা গেল, বিভিন্ন বুজুর্গদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। এদেশে সরকারি ছুটির জন্য সাতাশ তারিখকে নির্ধারিত করা হলেও অন্যান্য বেজোড় রাতসমূহে শবেকদর তালাশ করাও হাদীস শরীফের নির্দেশ। তাই সাতাশ তারিখের পাশাপাশি অন্যান্য রাতসমূহেও কমবেশি ইবাদত করা উচিত। আমাদের দেশে বিভিন্ন তরিকত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে বেশির ভাগই এ রাতে দেখা যায় পীরজাদাগণ ভক্তবৃন্দের সাথে রাতব্যাপী গণসংযোগেই ব্যস্ত থাকে। অথচ শাহজাদা, পীরজাদা, ভক্ত আশেকান প্রত্যেকের জন্যই এ রাত ইবাদতের রাত তা ভুলে যাওয়া উচিত নহে। হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর জীবনী শরীফে উল্লেখ আছে, একদা শুক্রবারে জুমার আযানের সময় হয়েছিল। তখনও ভক্ত আশেকগণ হযরত কেবলাকে (ক.) ঘিরে বসে রয়েছেন। তা দেখে হযরত ছাহেব কেবলা কাবা (ক.) রেগে জালাল হয়ে যান। ইরশাদ করেন, 'কি মিঞারা, আজকে জুমাবার তার খেয়ালও কি তোমাদের নেই? এখানে কি? মসজিদে যাও'? তখন সবাই মসজিদের দিকে যেতে লাগল। সুবহানাল্লাহ! সবসময় শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। খামখেয়ালীপনা কাজকর্মকে তরিকত মনে করলে শরীয়তের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। জুম্মাবারে জুমার গুরুত্ব ঠিক রাখতে হবে। যেহেতু ঐ পবিত্র রাতসমূহ বছরে একবারই আসে। কিন্তু পীর মুর্শিদ, পীরজাদাগণ সারা বছরই দরবারে থাকেন। সান্নিধ্য পেতে সময়ের অভাব হয় না। হযরত আছিয়ে গাউসুলআজমের (ক.) বড় পুত্র শাহানশাহ বাবাজান সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেও দেখা যেত শবে বরাত, শবে কদরের পবিত্র রাতসমূহে দরজা বন্ধ করে রাখতেন। মানুষ ভিড় করতে চেষ্টা করলে লাঠি হাতে তাড়াতেন। কখনো কখনো শহরে বা গ্রামেগঞ্জে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ। তাই পবিত্র দিন ও রাতসমূহের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও অন্যান্য বুজুর্গদের আদর্শ। অবশ্যই ফজর নামাযের জামাত আদায় করে ভক্তবৃন্দের সাথে সাক্ষাত দিয়ে ভক্তদের সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। হযরত মা আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনিও শবে কদর রাতে কোন্ দোয়াটি (এস্তেগফার) পাঠ করবেন তা আল্লাহর নবী (দ.) হতে জেনে নেন। তা হচ্ছে এই 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।' (মিশকাত শরীফ)। এ দোয়াটিও শবে কদর রাতে কমপক্ষে একশত বার পাঠ করা উচিত।

আল্লাহর নবী (দ.) শবে কদর রাতে হযরত মা আয়েশাকেও একটি 'ইস্তেগফার' শিক্ষা দিলেন। নিম্নের ইস্তেগফারটিও খুবই উত্তম। প্রতিবার পাঠ করলে গুনাহ মাফ হয়। তা হচ্ছে 'আস্তাগফিরুল্লাহাল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম গাফ্‌ফারুজ জুনুব সাত্তারুল উয়ুব ওয়া আতুবু ইলাইহি।' শবে কদর ছাড়াও দৈনিক ৭০ বার / ১০০ বার পড়তে না পারলেও অন্ততপক্ষে দশবার পাঠ করতেন।

এখন গোসল করা প্রসঙ্গে আসি। শবে কদরের বেলায় বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর নবী (দ.) ইরশাদ করেন, 'যারা শবে কদরের এবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করবে তাদের পা ধৌত করা শেষ না হতেই তাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে। সুবহানাল্লাহ।

এক. যাদের পক্ষে সন্ধ্যায় গোসল করা সম্ভব হয় তাদের উচিত দুই রাকাত 'তাহিয়াতুল অজুর' নামায আদায় করা। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর একবার সুরা কদর ও একবার সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত 'হুয়াল্লাহুল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া'----- হতে শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ পাঠ করতে হবে। রাতের শুরুতে এ নামাযে আল্লাহ খুবই খুশি হন।

দুই. শবে কদরে যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে একবার সুরা কদর ও তিনবার সুরা এখলাস পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ। তাহলে আল্লাহ তা'আলা নামাযী ব্যক্তিকে শবে কদরের রাতের সমস্ত ছওয়াব দান করবেন। আর দোয়া কবুল হবে। আল্লাহ তাকে হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত শোয়াইব (আ.), হযরত আইয়ুব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত নূহ (আ.) এর মত সওয়াব দান করবেন এবং বেহেশতে তাকে মশরিক (পূর্ব) হতে মাগরিব (পশ্চিম) পর্যন্ত একটি শহর দান করবেন। সুবহানাল্লাহ।

তিন. যে ব্যক্তি শবে কদরে চার রাকাত নামায পড়ে দুই রাকাত করে প্রথম রাকাতে সুরা কদর একবার ও সুরা এখলাস সাতাশবার পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ। তাহলে নামাযীর সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সে যেন মায়ের উদর হতে অদ্যই ভূমিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে এক হাজার মহল দান করবেন। সুবহানাল্লাহ।

চার. যে ব্যক্তি শবে কদরে দুই রাকাত নামায পড়বে প্রত্যেক রাকাতে সাতবার সুরা এখলাস পাঠ করবে। নামায শেষে সত্তরবার ইস্তেগফার পড়বে। তা হচ্ছে এই 'আস্তাগফিরুল্লাহাল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।'

ওই ব্যক্তি নামাযের স্থান ত্যাগ করার পূর্বে আল্লাহ তার ও তার পিতামাতার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং ফেরেশতাদিগকে তার জন্য বেহেস্তে ফলবৃক্ষ রোপনের নির্দেশ দান করবেন এবং তার জন্য বিশেষ জান্নাত মহল নির্মান কাজ শুরু করেন যাতে নহর (নদী) সমূহ বিদ্যমান। সুবহানাল্লাহ।

পাঁচ. যে ব্যক্তি শবে কদরে চার রাকাত নামায পড়ে। দুই রাকাত করে নিয়ত। প্রথম রাকাতে সুরা কদর তিনবার ও সুরা এখলাস পঞ্চাশবার। দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ। এভাবে চার রাকাত নফল নামায আদায় করতে হয়। নামাযের পর সিজদায় গিয়ে একবার পড়তে হয় 'সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।'

ফজিলত : নামাযীর দোয়া কবুল হবে। গুনাহ মাফ হবে। আল্লাহ তাকে অসীম নেয়ামত দান করবেন।

ছয়. শবে কদরে বার রাকাত নফল নামায পড়া যায়। দুই রাকাত করে নিয়ত। প্রথম রাকাতে একবার সুরা কদর এবং দ্বিতীয় রাকাতে একবার সুরা কাফেরুন পাঠ করা। তারপর চল্লিশবার হযরত মা আয়েশা (রা.) এর ইস্তেগফার দোয়াটি পড়তে হয়। এতে বেশুমার সওয়াব প্রাপ্ত হবে।

সাত. পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মৃত হলে প্রত্যেকের জন্য দুই রাকাত করে বার রাকাত নামায আদায় করা উত্তম।

আট. চার রাকাত সালাতুত তাসবিহের নামায পড়া উত্তম।

নয়. হযরত আলী (ক.) বলেন, যে কেউ শবে কদরে সাতবার সুরা কদর পড়বে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বালা মুসিবত হতে রক্ষা করেন। যারা বুজুর্গদের মাজার ও মুরুব্বিদের কবর জেয়ারত করতে যান তাদের যথাসম্ভব প্রত্যেক মাজারে একশ বার সুরা এখলাস, একশবার দরুদ শরীফ ও একশবার এস্তেগফার পাঠপূর্বক জেয়ারত করা উত্তম। পরিশেষে একটি কথা আবারও বলব, শবে কদরের রাতটি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানই মুসলমানদের মূলধন।

ঈদ : ইবাদত ও আনন্দের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব বা খুশি। ঈদ-উল-ফিতর বলতে বুঝায় দীর্ঘ একমাস দিনের বেলায় পানাহার বিরতির কঠোর অনুশীলন কর্ম শেষে স্বভাব আহারে ফিরে যাওয়ার আনন্দ। আবুল মনসুর আহমদ তার বাংলাদেশের কালচার গ্রন্থে লিখেছেন, ঈদ অর্থ 'উপবাস ভঙ্গের আনন্দ উৎসব'। ইসলামী পণ্ডিতদের অনেকের মতে 'ফিতরা' শব্দ থেকে ফিতর শব্দটির উৎপত্তি। অর্থাৎ দান, যাকাত, সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের ধনী, দরিদ্র একসঙ্গে আনন্দ উৎসব করার নামই হলো ঈদ-উল-ফিতর।

ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সার্বজনীন আনন্দ উৎসবের জন্য যে দুটি দিবস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তন্মধ্যে একটি ঈদ-উল-ফিতর, অপরটি ঈদ-উল-আযহা।

কেন ইসলাম এমন দুটি উৎসবের বৈধতা দিল, কোন প্রেক্ষাপটে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) ঈদের উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তার ইতিহাস বা বাস্তব ঘটনা আজ মুসলমানরা কতটুকু অবগত আছেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ, আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানরা ধর্মকে লালন করি অনুকরণের মাধ্যমে, শুনে এবং বলে। অনুশীলন, পঠন বা জানার অনাগ্রহ আমরা আমাদের সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলেছি। একধরনের পুরোহিত ও যাযকতন্ত্র আমাদের ইন্দ্রিয়জালকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর, সহজ-সরল ও সার্বজনীন প্রগতিশীল ধর্ম ইসলামকে কঠিনতর চেয়ে কঠিন করে তুলেছি। অথচ আমাদের বলা হয়েছে প্রথম 'পড়া'র জন্য; জ্ঞানার্জনের চর্চা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তার বৈপরিত্যে আমাদের পথচলা বিধায় জঙ্গীবাদ আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। যখন পড়া ও ইসলাম সমান্তরালে পথ চলেছিল তখন মদীনা মনোয়ারা, কুফা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শান্তি নিকেতনে পরিণত হয়েছিল। সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তাবৎ পৃথিবীর মানুষ ছুটে আসছিল ঐসব নগরে জ্ঞান অন্বেষণে। আজ কিন্তু মুসলমানদের উল্টোযাত্রা। কারণ পড়া শব্দটি পরিত্যাজ্য হয়েছে। যাযকতন্ত্রের সুর-মুর্ছনায় মোহিত হয়ে ইসলামকে তার গতিপথ থেকে সরিয়ে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ভুলুণ্ঠিত হতে চলেছে।

আজকাল ঈদেও তাই লক্ষ্যণীয়। ঈদের আগে রোযা বা সিয়াম যার অনুশীলন বিরতিহীন ভাবে একমাস এরপর ঈদ আনন্দ উৎসব। যাকে পণ্ডিতদের ভাষায় বলা হয় 'পুলকানন্দে ফাটিয়া পড়া'। কি কঠোর সংযম ধৈর্য ও কৃচ্ছতা সাধন। দিনে পানাহার বিরতি, পাপাচার বর্জন, রাতে এবাদত আর কুরআন তেলাওয়াত। একেবারে একাগ্রতা সহকারে কঠোর আরাধনার পর শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আবারও স্বভাব জীবনে ফিরে আসার এক আনন্দের তীব্র অনুভূতির নাম ঈদ-উল-ফিতর। এ ঈদ তাদের জন্য যারা মাসব্যাপী সাধনার স্বাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। যারা অনুশীলন করেছেন ১. সংযম ২. ধৈর্য ৩. সদাচার ৪. বিনয় ৫. সহনশীলতা ৬. সহযোগিতা ও ঐশী প্রেমকে আয়ত্ত করেছেন তাদের। তাই কঠোর সাধনার পর যখন মানবতা আনন্দের ফল্গু ধারায় প্রবাহিত হবে তখনও তার লাগামটা ক্ষণিকের জন্য টেনে ধরার বিধান করা হয়েছে উৎসবের শুরুতে।

আবুল মনসুর আহমদ তার বাংলাদেশের কালচার গ্রন্থে এ বিষয়ে মার্জিত ব্যাখ্যা দেন এভাবে 'ঈদের (সকালে) জামাতে দুই রাকাত নামাযের বিধান আছে বলিয়াই ঈদের সমাবেশ প্রার্থনা সভা হইয়া যায়। নামাযের বিধান করা হয়েছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। ...সে উদ্দেশ্যে সাবধানতা: প্রতিষেধকের ব্যবস্থ। দীর্ঘ সংযমের শেষে যখন মানুষকে ভোগের অধিকার দেওয়া হয় তখন এই সাবধানতাটুকুর দরকার হয়। মানুষের মনের অবস্থা হয় তখন সদ্যমুক্ত দীর্ঘদিনের কয়েদির মতো। তার ভোগ স্পৃহা হয় খাপছাড়া পাখির মতো উদ্দাম। লালসায় আসে তার প্রবল বন্যা, বিপুল জোয়ার। মানুষ ভাসিয়া যাইতে পারে সে বন্যায়। সে ইন্দ্রিয় সেবায় উন্মত্ত হইতে পারে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। অতীতে এমন অনেক হইয়াছে। ধর্মীয় আনন্দোৎসব, বীভৎস অনাচারের ভৈরবী চক্রে রূপান্তরিত হইয়াছে এমন নজির ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভর্তি। প্রতিষেধকের সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়াই এসব ঘটিয়াছে। তাই ইসলামে এই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে দু'রাকাত নামাযের বিধান করিয়া। ঈদের উৎসবের সাথে দুই রাকাত নামায জুড়িয়া দিয়া শরীয়ত মুসলমানদের শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়া দিয়াছে যে, উল্লাসের আতিশয্যে তারা যেন খোদাকে ভুলিয়া না যায়'। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো আমরা রোযাও রাখছি। ঈদের দু'রাকাত ওয়াজিব নামাযও আদায় করছি। তবে রোযা ও ঈদের নামাযের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি আমরা অনুভূতিতে ঠাঁই দিচ্ছি না। আল্লামা রুমীর ভাষায়-

'হার কছে আয যন্নে খোদ শুদ ইয়ারে মান
ওয়ায দুরূনে মান না জুস্তাসরারে মান' ॥

'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ খেয়াল ও ধারণা অনুযায়ী আমার বন্ধু সাজিল কিন্তু আমার অন্তরে লুকায়িত গুপ্ত রহস্যের সন্ধান কেহই পাইল না'।

তাইতো সিয়াম পালনের পর ঈদের আনন্দ উৎসবে তার নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়ার যে সৌভাগ্য বান্দার হয় কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে না পারার পরিণতি শুধু আমাদেরই ক্ষতি হয় না বরং আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য জীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ঈদ আনন্দের সুযোগে আজ সমাজ এমন সব সংস্কৃতি চর্চা করছে যার সাথে পূর্বাপর কোন কিছুরই যোগসূত্র নেই। ওই সংস্কৃতির সাথে ধর্মের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। আজকাল দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক জার্নালগুলো ঈদকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতির এক সৃজনশীল চর্চা শুরু করেছে। ঈদের আনন্দকে উপভোগ্য করতে এ উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু এসব সাহিত্যেও ঈদের প্রকৃত চেতনা ও ভাব প্রায় উপেক্ষিতই থেকে যায়। ইসলামের গৌরবজনক কোন অধ্যায় কোথাও রচনা হয় বা প্রদর্শিত হয় না। ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়া গুলোর একই অবস্থা। ফলে প্রজন্ম যে ঈদের সাথে পরিচিত হচ্ছে তা জাতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও চেতনাকে ধ্বংস বৈ কিছুই করবে না।

সে যাক, যে কথাটি বলতে চেয়েছি তা হল ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বিশ্বব্যাপী মানবতার মধ্যে এক সাম্য ভ্রাতৃত্ব সৌম্য ও মিলনের বারতা প্রকাশ করে। বিশেষত আমাদের দেশে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরকে কেন্দ্র করে এমন এক মজবুত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশে পরিণত হয়েছে। রোযার পাশাপাশি প্রতিটি ঘরে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার এক অমোঘ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এ প্রস্তুতি আনন্দের আত্মহারায় একাকার হওয়ার। নেই ভেদাভেদ, জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র, কুলিন-অকুলীন সবাই এক, সবাই সমান। এমনকি আমাদের পড়শী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এ আনন্দস্রোতে একাকার হয়ে যায়। তাদের শুভেচ্ছা, সৌহার্দ এক অনাবিল শান্তি ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে।

বাঙালি সবাই এক সুতোয় আত্মীয়তার বন্ধনে যেন আবদ্ধ হয় ঐদিনের পোশাকে, খাবারে, চলাফেরায় আতর-গোলাপে। তাই বলি-

ঈদ সাম্যের গান গায়। কারণ-

১. ধনী দরিদ্র সবাই একসাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামায আদায় করে।

২. সবাই কমবেশি নতুন জামা পরিধান করে।

৩. ধনীরা তাদের নিকট সঞ্চিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও নিঃস্বদের দিয়ে ঈদ আনন্দ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. ধনী দরিদ্র সকলেই সমানাহারে ফিতরা আদায় করে।

৫. ধনী দরিদ্র সকলেই কমবেশি গৃহ বা বাসায় আপ্যায়ন পরিবেশন করে।

৬. প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর কুশল বিনিময় ও কোলাকুলি করে।

এছাড়া ঈদের সামাজিক অনেক বিষয় রয়েছে যা প্রতি মুহূর্তে মানব সমাজের আদর্শ হিসেবে অনুকরণীয় হয়। কিন্তু সামাজিক তাৎপর্যও সংস্কৃতির আগ্রাসনের মতো হয়েছে। এখানেও ঈদগাহেই সাম্যের সমাপ্তি টানানো হয়। অথচ প্রিয়নবী (দ.) একজন নিঃস্ব শিশুকে বাদ দিয়ে ঈদ উৎসবে শরীক হননি।

মূলত রাসূলুল্লাহ (দ.) এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রচার, প্রসার ও অনুশাসনকে মানুষের কাছে সহজতর করানোর জন্য তিনি ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রথা ও রীতিনীতিকে একেবারে বাদ না দিয়ে তাকে সুষ্ঠ ও নৈতিকতার মানদন্ডে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এটি ছিল মহানবী (দ.) এর একটি প্রজ্ঞাময় কৌশল এবং ইসলামের সার্বজনীনতার প্রকাশ। নবীয়েপাক (দ.) এর নীতি ও দর্শন ছিল অনৈতিক বিশৃঙ্খলা দমন হবে তবে প্রাতিষ্ঠানিক মূল ভিত্তি অক্ষুন্ন রাখা হবে। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা এই কৌশলের অংশ মাত্র। পবিত্র হাদীস শরীফে এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি রয়েছে-

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা মনোয়ারায় তাশরীফ আনলেন তখন সে জামানায় মদীনাবাসীরা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বছরে দুটি আনন্দ উৎসব করতো (উৎসব দুটি ছিল মেহেরগান ও নওরোজ) প্রিয়নবী (দ.) তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এগুলো কোন দিন? উপস্থিত লোকজন জানালো জাহেলী যুগ থেকে এই দুদিন আমরা আনন্দ করে আসছি। তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করলেন আল্লাহ তা'আলা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য আরো উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন- ১. ঈদুল ফিতর ২. ঈদুল আযহা। তাছাড়া এই সময় মক্কার কাবাকে কেন্দ্র করে ওকায নামক বিশাল মেলার আয়োজন হতো। যেখানে সংস্কৃতির নামে অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, গোত্রীয় কৌলিন্য, নারী, মদ ও জুয়া ইত্যাদির অসর বসত। যার চূড়ান্ত পরিণত ছিল যুদ্ধ ও রক্তপাত। রাসূলুল্লাহ (দ.) এ ধরনের অপসংস্কৃতি ও রক্তাক্ত মেলার অবসান ঘটালেন। তবে কাবাঘরকে কেন্দ্র করে এক বিশাল পবিত্র সম্মিলনের ব্যবস্থা করলেন যার নাম পবিত্র হজ্ব।

সুতরাং আমাদের বোধশক্তিকে জাগ্রত করা প্রয়োজন যে, ঈদ-উল-ফিতর কোন প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে আজকাল যে ঈদ-উৎসব পালিত হয়ে থাকে তার গতি প্রকৃতি মূল উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত কিনা; রাসূলুল্লাহর বিধান সম্মত ঈদ কিনা? নাকি জাহেলিয়ার মেহেরগান ও নওরোজ তা মূল্যায়ন করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সার্বজনীন ঈদ উৎসব পালন করার সামর্থ দান করুন, আমিন।

তৃতীয় নয়ন

রূপদর্শী

[১৪২৫ বাংলার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে পাঠকনন্দিত কলাম 'তৃতীয় নয়ন' অন্তর্ভূক্ত করে নিয়মিত কলাম হিসাবে পুনঃ প্রকাশের প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান রচনাটি আজ থেকে প্রায় ২০ বছর পূর্বে জীবনবাতির পাতা থেকে পাঠকদের জন্য সংগ্রহপূর্বক যুগোপযোগী সম্পাদনা ও সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে পুন:মুদ্রণ করা হলো। আশাকরি এই রচনার বক্তব্য ও আহ্বান সময়ের তারতম্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আজকের যুগোপযোগিতায়ও পাঠকদের বিবেচনায় নন্দিত হবে।- বিভাগীয় সম্পাদক]

ভাবনা, চিন্তা বা পর্যালোচনা করিবার জন্য যে শক্তি বা চেতনা মহান আল্লাহপাক মানুষের কর্মক্ষমতায় প্রদান করিয়াছেন তাহার ফলেই সাহিত্য মতবাদ দর্শনসহ ইত্যকার যাবতীয় প্রসঙ্গে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতরূপে তাহাদের চিন্তাপ্রসূত বাণী সমূহ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিনিয়ত কত ধরনের বই পুস্তক সাময়িকী প্রকাশিত হইতেছে এবং তাহাতে কত শত সহস্র লেখক তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরূপিত ঘটনার বিশ্লেষণে এবং প্রকাশিত বক্তব্যের বাদ-প্রতিবাদে নিমগ্ন রহিয়াছেন। লেখনীর এই মাত্রা কি বিপুলায়তনে স্ফীত হইতেছে যাহারা এই বিষয়ে আগ্রহী হয়তো তাহারাই সম্যক অনুধাবনে ও ধারণা নির্মাণে সমর্থ হইবেন। সম্প্রতি যেই কলামটি লইয়া আমি জীবনবাতির প্রতিসংখ্যায় আপনাদের সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত হইবার অবকাশ লাভ করিয়াছি তাহা তৃতীয় নয়ন নামধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলেও নয়নের দর্শন ক্ষমতা যে এই কলামের লেখায় বর্তমান ক্ষেত্রেও একেবারেই অনুপস্থিত তাহা পাঠকবৃন্দ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া না বলিলেও বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে। অতীতের কোন এক সময় পার্লামেন্টের অধিবেশনে জনৈক সদস্য নাকি পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলিবার জন্য সহযোগী অপর এক সদস্যের নিকট হইতে কিছু পয়েন্ট ধার চাহিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে আমার অবস্থাও অনভিজ্ঞ সেই অবোধ সদস্যের মতই 'দর্শনক্ষমতা' ধার চাহিবার পর্যায়ভূক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। মাননীয় পাঠকবৃন্দ আপনাদের দৃষ্টিতে যদি এই ধরনের কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট বা অনুভূত হইয়া থাকে তাহা হইলে নাচার এই কলাম লেখককে ধার প্রদান করিলে বড়ই উপকৃত হইব শুধু তাহাই নহে উপরন্তু এই পত্রিকার পাঠকগণ ভবিষ্যতে তৃতীয় নয়ন কলামের বিষয়ে তাহাদের অসন্তুষ্টি নিরসনের অবকাশও হয়তো খুঁজিয়া পাইতে সক্ষম হইবেন। সম্মানীয় পাঠকবৃন্দ আপনাদের সহায়তা না পাইলে এই কলাম লেখার পরিবর্তে 'আমি অন্ধ কপালমন্দ তোমাদের কাছে জানাই'-এই চরণ সম্বলিত গান গাহিয়া বেড়ানো ব্যতিত অন্য কোন কর্ম আমার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। 'দুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন' বলিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য যে আহ্বান জানানো হয় বন্যা-আক্রান্ত বাংলাদেশের দুর্গত জনগণের জন্যতো বটেই সম্ভবত আমার মত লেখকদের জন্যও এই রকমের একটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। চিন্তার ক্ষেত্রেও দুর্যোগে বা দুভিক্ষে আক্রান্ত বিপন্ন লেখকদের জন্য এই ব্যবস্থা কি অপরিসীম ও অকাট্য অর্থবহতা ধারণ করিতেছে তাহা এখন আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

বিগত সময়ে জীবনবাতিতে প্রকাশিত একটি বিষয় আমার কাছে নতুন এক অনুধাবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। আমার এই বক্তব্য এবং চিন্তা অনেকের কাছে নিঃসন্দেহে নিছক বাতুলতা মনে হইতে পারে। কারণ যে কোন ঘটনা বা অবলোকনে ব্যক্তির মানসিকতা, মনন-ধীশক্তি

সর্বোপরি প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অতএব আমার এই অনুধাবনের অভিব্যক্তি যদি কাহারো নিকট কচকচানি কিংবা প্যাচালের পর্যায়ভূক্ত গণ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের ধৈর্যের উপর এই উৎপীড়নের জন্য নিতান্ত করুণা প্রদর্শনপূর্বক অধমকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

'মোমবাতি কেমন করিয়া জ্বলে'? এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি তথ্যমূলক বিবরণ জীবনবাতির একটি সংখ্যায় উপস্থাপন করা হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের পাঠকদের জন্য এই রচনাটি সহজবোধ্য করিবার জন্য মোমবাতি কেমন করে জ্বলে? লেখাটি পুনরুল্লেখ করছি।

মোমবাতি তৈরি হয় মোম দিয়ে। মোমের মধ্যে থাকে হাইড্রোকার্বন (hydrocarbon) নামে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক বস্তু। হাইড্রোকার্বন ও কার্বন এই দুটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে মোমবাতির ভেতর দিয়ে সুতোর তৈরি একটি সলতে ঢোকানো থাকে যার কিয়দংশ মোমবাতির উপরিভাগে বের করে রাখা থাকে। এই সলতেয় আগুন ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তাপে প্রথমে কঠিন মোম গলে গিয়ে তরল হয়ে যায়। তারপর ঐ তরল মোম রূপান্তরিত হবে বাষ্পতে- যে বাষ্প জ্বলতে পারে। এই পদ্ধতিতে মোমবাতির সলতের মাথায় ঐ তরল মোম ক্রমাগতভাবে ম্যাজিকের মত উঠে আসতে থাকে- তাকে বলা হয় 'ক্যাপিলারি অ্যাকশন' (Capallary action)। মোমবাতির হাইড্রোকার্বনের দাহ্য বাষ্প পোড়ার ফলেই এই আগুন জ্বলতে থাকে। বলাবাহুল্য এই প্রজ্জ্বলনের সময় বাতাসের অক্সিজেনের সহায়তা জরুরী। বাতাসের অক্সিজেন ও মোমবাতির বাষ্প (যা তরল মোম থেকে উৎপাদিত হচ্ছে) এই দু'য়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই মোমবাতি থেকে আলো এবং তাপ দুটোই পাওয়া যায়।

মোমবাতির আগুন যে মোমের বাষ্প পোড়ার ফলেই পাওয়া যায় তা সহজ একটি উপায়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি। মোমবাতি ফু দিয়ে নিভিয়ে সাথে সাথে একটি জ্বলন্ত দেশলাই এর কাঠি মোমবাতির সলতের এক ইঞ্চি উপরে ধরলে দেখা যাবে সদ্য নেভানো মোমবাতিটা আবারো দপ করে জ্বলে উঠবে। কারণ আগুনের শিখা থেকে মোমবাতির সলতের ওপরের দাহ্য বাষ্পে আগুন ধরে যায় এবং সেই সঙ্গে মোমের সলতের আগুন জ্বলে উঠে। মোমবাতির দৃশ্যমান শিখার অন্তরালে যেমনভাবে নিবন্ধে বর্ণিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যক্রম সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে মানুষের দৃশ্যমান চেহারা বা সুরতের অন্তরালেও কি সেই অভিন্ন পদ্ধতিতে অনুরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হইতেছে? মোমবাতি যেমন সর্বধর্মে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়া থাকে মানুষও সর্বসৃষ্টির নিকট মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতি ও বিবেচনা লাভে সমর্থ হইয়াছে। মোমের (হাইড্রোকার্বন) উপাদান দ্বারা মোমবাতির আকৃতি গঠিত হইয়া থাকে অনুরূপভাবে মৃত্তিকার সহায়তায় মানব দেহটি গঠিত হইয়া থাকে। মোমবাতির মধ্যে মধ্যাংশে চালিত সুতা উহার চরিত্র এবং গ্রহণযোগ্যতাকে বিকাশের অবকাশকে ধারণ করিয়া থাকে অনুরূপভাবে রূহ বা প্রাণ মানবদেহকে সমাজে ও সর্বসৃষ্টির মাঝে গ্রহণযোগ্যতায় অভিষিক্ত ও শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আগুনের স্পর্শ যেমনভাবে মোমবাতিকে উহার চরিত্র বিকশিত হইবার অবকাশ প্রদান করিয়া থাকে মানবের মধ্যে শিক্ষার আলো (এই শিক্ষা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীধারী নহে) মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃস্টির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বীয় চরিত্রের বিকাশ সাধনে সামর্থবান করিয়া তোলে। কঠিন মোম গলিয়া গিয়া বাষ্পে রূপান্তরিত হইয়া যেভাবে মোমবাতি আলো প্রদান করিয়া থাকে অনুরূপভাবে মানবের মধ্যে মানবতার চর্চা, কল্যাণকামী কর্মতৎপরতা সমূহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বে মানুষের উন্নততর অবস্থানের যৌক্তিকতাকেও বিকশিত করিয়া থাকে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া মোমবাতির সলতের মধ্যে লাগাইলে মোমবাতি জ্বলিয়া উঠে। মোমবাতির এই প্রজ্বলন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করিতেছে অক্সিজেন নামক অপরিহার্য অদৃশ্য উপাদান। মানব সৃষ্টির মধ্যেও মোমবাতির ক্ষেত্রে অগ্নিরূপী জ্ঞানের স্পর্শ সলতের ন্যায় মানবচিত্ত বা রূহে মানবের চরিত্র বিকাশের উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। রহমতুল্লিল আলামিন এর করুণার ছায়া মোমবাতির প্রজ্বলনে অদৃশ্য অক্সিজেনের মতোই আমাদের মানবজীবনকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে বিকাশের ক্ষেত্রে অব্যাহত সহায়তা করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সেই সহায়তা লইয়া যদি নিজের জীবনকে প্রজ্বলিত করিবার উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা হইলেই তাহার মানবজন্ম সফল করিবার সুযোগ সে লাভ করিতে পারিবে এবং আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে স্রষ্টার মহান উদ্দেশ্যকে সফল করিবার দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হইবে। রহমতুল্লিল আলামিন এর প্রাণদায়ী এই অনুদান এই জগতে বেলায়তের ধারায় অলীয়ে কামেলদের মাধ্যমেই প্রবহমান রহিয়াছে। মোমবাতির জন্য

অক্সিজেনরূপী ও মানবের জন্য করুণার ধারায় বেলায়তের প্রকৃত শিক্ষায় যাঁহারা নিজেদের জীবনকে শিখাময় করিতে পারিবেন তাহারাই মহান আল্লাহর অভিধায় আশরাফুল মখলুকাত রূপে নিজেদেরকে সফলভাবে বিকশিত করিতে পারিবেন। ইহাতে কি কোন সংশয় রহিয়াছে?

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইবার জন্য রকমারী চমকদার আকৃতির ও রং-এর মোমবাতি বাজারে পাওয়া যায়। যে সকল মোমবাতি আগুনের স্পর্শ পাইয়া জ্বলিবার অবকাশ লাভ করিয়াছে সেই মোমবাতি গুলোই স্বীয় চরিত্রে বিকশিত হইবার অবকাশ লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট অব্যবহৃত মোমবাতি গুলো পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হইতেছে অথবা ভিন্নতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ সৃষ্ট হইবার পরও উহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত জীবনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। অনুরূপভাবে মহান স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট মানবের মধ্যে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন এর বর্ষিত করুণাধারায় যাহারা সম্পৃক্ত হইয়া মানবতার কল্যাণে সত্য ও ন্যায়ের আলোকে সিরাতাল মোস্তাকিম-এ থাকিবার প্রত্যাশায় তাহারই নির্দেশিত মত ও পথে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়াছেন তাহারা নিজেদেরকে আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করিতে পারিয়াছেন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে রহমতুল্লিল আলামীন এর খজিনা তথা আধার হিসাবে আবির্ভূত হইয়া গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) মানুষকে উন্নততর অবস্থানে পৌছাইবার লক্ষ্যে যেই কামালিয়তের কর্মপন্থা সমূহের দিগনির্দেশনা প্রদান করিয়াছেন সেই ধারাই মাইজভাণ্ডারী তরিকা বা দর্শন হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি বিনির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। মোমবাতির আলো যেভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য নিজের গুণাবলীকে উন্মুক্ত করিয়া রাখে তেমনিভাবে রহমতুল্লিল আলামীনের সঞ্চালিত শিক্ষার আলো বিতরণের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে মাইজভাণ্ডার নামের এই গ্রাম তার সাধারণ পরিচয়কে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম মিলনকেন্দ্র হিসাবে আজ বিশ্বের মানচিত্রে গৌরবান্বিত পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা বিনির্মাণে সমর্থ হইয়াছে। এই আলোর সহিত সম্পৃক্ত হইয়া অসংখ্য ব্যক্তিত্ব খোলাফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী পরিচয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে হাদিয়ে কামেল হইয়া সেই আলোর দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া মানব এবং মানবতার উন্নয়নে ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছেন। মানবের রিপু সমূহকে সুনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অছি-এ-গাউসুলআজম খাদেমুল ফোকরা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী গভীর পর্যবেক্ষণে উসুল-এ-সাবআ বা সপ্তকর্মপন্থা অভিধায় পরিচিহ্নিত করিয়াছেন। বস্তুত গোলাপকে যেই নামেই ডাকা হউক না কেন গোলাপ গোলাপই থাকিবে। ফলে উপকার পাইবার কামনায় যাহারা এই ফুলের সুবাস আহরণে আগ্রহী থাকিবে তাঁহারা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান ভাবিবার অবকাশ তৈরি করিতে সমর্থ থাকিবেন। আর যাহারা অবহেলায় বা নানান অজুহাতে এই সুবাসের সান্নিধ্য হইতে নিজেদেরকে বঞ্চিত বা সম্পর্কচ্যুত করিতে ইচ্ছুক থাকিবে কৃতকর্মের কারণে অব্যবহৃত মোমবাতির ন্যায় আলো বিতরণ ব্যতিরেকে উহারা পুনঃ মোমবাতির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কিংবা ভিন্ন কোন প্রয়োজনে শুধুমাত্র পণ্য মোম হিসাবে ব্যবহৃত হইবার উপযোগিতায় নিজেদেরকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। বস্তুত ইহারাই খোদায়ী নেয়ামত অর্জনের সম্ভাবনা সমূহকে পদদলিত করিয়া তথা প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে দুর্ভাগা হিসাবে পরিগণিত করিতে থাকিবে। প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি ফু দিয়া নিভাইয়া অব্যবহিত পরবর্তীতে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরিলে নির্ধারিত দূরত্বের অবস্থান হইতেও সলতে আগুনকে টানিয়া লইয়া নিজেকে প্রজ্বলিত করিবার ক্ষমতা যেমনিভাবে মোমবাতি অর্জন করিতে পারে অনুরূপভাবে মানুষও স্বীয় সাধনায় কিংবা পীরে কামেলদের সহায়তায় মোমবাতির সলতের ন্যায় জীবনকে কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্যাণ এবং মঙ্গলের আলোকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রজ্বলনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিয়া মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়। বিশেষ অবস্থান হইতে আগুনের স্পর্শের সীমায় আসিলে যেমনিভাবে মোমবাতিতে শিখা প্রজ্বলিত হয় অনুরূপভাবে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের সহায়তায় মানুষও নিজের হৃদয় বা চিত্তকে কল্যাণের আগুনে প্রজ্বলিত করিয়া আশরাফুল মখলুকাত রূপে স্রষ্টার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে সফল করিবার ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষমতা বা খোদার খলিফা রূপে সৃষ্টির যথার্থতা ও যৌক্তিকতার প্রতিষ্ঠায় সামর্থ অর্জন করিতে পারে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই মিলের ভাবনা কি কোন কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা আহ্বান হিসাবে রচনার সামর্থ কিংবা যৌক্তিকতা আদৌ ধারণ করে কিনা বিচারের ভার আপনাদের হাতেই ন্যস্ত রইল।

হারানো মানিক

প্রাচীন প্রকাশনা পরিচিতি : প্রসঙ্গ মাইজভাণ্ডার

সৌজন্যে : খাদেমুল ফোকরা ফাউন্ডেশন

দেড় শতাধিক বছরের ইতিহাসে মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্মধারাকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত ও প্রচলিত ভক্তিবাদী গীতি কবিতা পর্যায়ক্রমে এখন 'মাইজভাণ্ডারী গান' পরিচয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে ব্যাপকভাবে জাগরণে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘ সময় পূর্বে 'মাইজভাণ্ডারী সাংস্কৃতিক পরিষদ' কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে প্রায় ৮০০০ এর অধিক প্রকাশিত গানের তথ্য প্রকাশ করেছে। তৎপরবর্তীতে অব্যাহত ভাবে রচিত হয়ে এই দরবার সংশ্লিষ্ট গানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এই সংখ্যা কতটা বিপুলায়তনে রূপান্তরিত হতে পারে তা নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়। মাইজভাণ্ডারী গীতি কবিতার বই প্রকাশের ইতিহাসে মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী একটি অত্যুজ্জ্বল স্মরণীয় নাম। আশাকরি অনুসন্ধিৎসু পাঠক, লেখক ও গবেষকবৃন্দ এই উদ্যোগকে তাঁদের পরবর্তী ভাবনা চিন্তার সূত্রধর হিসাবে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। পর্যায়ক্রমে 'আগুপাঠ' শিরোনামে ১৯১৩-১৪ সনে প্রথম প্রকাশিত এই রচনা আমরা পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

সংকলন পরিচিতি

গ্রন্থের নাম : আগুপাঠ

রচয়িতা : জনাব মাওলানা আবদুল গণি

গ্রন্থের প্রকৃতি : কাব্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮+৪ (কভার)

মোট পংক্তি : ৩৮৪

রচনা সমাপ্তির তারিখ : ১০ কার্তিক ১৩১২ বাংলা সোমবার, প্রথম প্রহর।

প্রথম সংস্করণ : ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক : নোয়াখালী হতে নোয়াখালী যন্ত্রে আহমদ উল্লা দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য : দুই আনা

সংগ্রহ : লেখকের উত্তরাধিকারীদের সৌজন্যে।

আগুপাঠ

অহে প্রভু নিরাকার সর্ব্বকার মূল
তব রূপ গুণে কেহ নহে সমতুল ॥
সমতুল কে হইবে নাহিক দোসর
আগুরূপ গুণে আপে মাত্র মনোহর ॥
মনোহর হয়ে যেই রূপের সাগর
প্রেম বিনে শান্ত নহে কভু একেশ্বর ॥
তেকারণে ছল রূপে নিজ গুণ বলে
প্রেমের নিমিত্তে আপে এলা এ বিপুলে ॥
জ্ঞানার্ণবে গুণ বলে করিয়ে তরঙ্গ
সর্ব্বস্থানে প্রকাশিলা বিম্ব নানা রঙ্গ ॥
নানা গুণে নানা বিম্ব করিয়ে স্থাপন
আগু প্রেমুদ্যান ভব করিলা সৃজন ॥
নানা রঙ্গ পুষ্প বিকশিয়ে সে উদ্যান
মধুপ হইয়ে কর প্রেম মধুপান ॥
কিন্তু সেই মধু পানে অহে প্রাণকান্ত
প্রেমের তাড়না কিছু না হইল শান্ত ॥
মরমে মজিয়ে রৈল নিজ মর্ম্মভেদ
এইসব পুষ্প প্রেমে না পুরিল খেদ ॥
তেকারণে নর পুষ্প করি মনোরম
ভাবুদ্যানে কৈল্যা তাহে নিজ প্রিয়তম ॥
তবে মনমতে তার সাথে নানা রঙ্গে
খেলিলা প্রেমেরি খেলা প্রেমের তরঙ্গে ॥
প্রেমের বসন্ত ঋতু এল ভবুদ্যানে
ফুটিল সুপুষ্প অলি ভ্রমে গুণু গুণে ॥

চৌপদী গান

অহে প্রাণকান্ত, আসিল বসন্ত,
নাই সুখ অন্ত, প্রেমেরি উদ্যানে
পুষ্প বিকশিত, চৌদিকে মোহিত
অলি উল্লাসিত, ভ্রমে প্রেম গানে ॥
চন্দ্র পরিপূর্ণ, সর্বত্রে প্রসন্ন,

পুলকিত মন, পুষ্পের সুঘ্রাণে
কুসুম মঞ্জরে, গুণ গুণ কৈরে,
ভ্রমেরে গুঞ্জরে, ফুলের বাগানে ॥
পাখির ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে,
প্রাণে হাহাকারে, প্রাণসখা বিনে
হৃদ মধুস্থলে, সমীর হিল্লোলে,
সদা হেলে দোলে, প্রিয়ার কারণে ॥
মম মধুকর, আসিয়ে সত্বর,
কর সমাদর, হৃদ মধুপানে
মিশিয়ে দুজন, নয়নে নয়ন,
প্রণয় প্রদান, কর আলিঙ্গনে ॥
হৃদয়েরি ধন, ভাণ্ডারী সুজন,
করহ আসন, হৃদ সিংহাসনে
মকুল মারিয়ে, চরণে মিশায়ে,
একাকার হৈয়ে, তোষ সুদর্শনে ॥

মানব শ্রেষ্ঠতা

সত্তা সুবর্ত্তনপুরে ছিল সত্তরাজ
আপে একেশ্বর কিন্তু বিপুল সমাজ ॥
স্বীয় সত্ত্ব গুণে নির্ম্মি বিবিধ দর্পণ
অহরহ হেরে আপ্ত বিমল বদন ॥
নিজ গুণে সে চতুর কেমন প্রচুর
যার সত্ত্ব গুণ ছবি এসব মুকুর ॥
গুণ চিত্র করিয়ে সে এসব দর্পণ
রাখিলা তাহার নাম ত্রিলক্ষ ভুবন ॥
ভুবন কাহারে বলে মানব আকার
যার পট ছিল এই সয়াল সংসার ॥
জ্ঞানহীনে কি করিব মানব বর্ণন
মানব আকার মাত্র উত্তম দর্পণ ॥
জ্ঞানার্ণবে তরঙ্গিয়ে সেই মহারাজ
জ্ঞান আর্শি করি নরে করিলে বিরাজ ॥
মানবের প্রতি অঙ্গ বটে জ্ঞান কৃত
সেই জ্ঞান গুণে নর সতত অমৃত ॥
জ্ঞানের সাগর মাত্র মানব আকার
কোরাণ নামেতে যাহা জগতে প্রচার ॥
স্বর্গয়ে স্বর্গয়ে তাহে কৈরাছে বর্ণন
সেই স্বর্গ পাঠে স্বর্গে করিতে গমন ॥
স্বর্গ কারে বলে মহারাজার দর্শন
যার রূপে সুশোভিত মানব দর্পণ ॥
ছয় দিনে এ দর্পণ হইল নির্ম্মিত
সপ্তমেতে মহারাজ তাতে বিরাজিত ॥
তার সপ্ত অঙ্গ মাত্র কোরানের স্বর্গ
যার মর্ম্ম পাঠে পায়ে নরে সপ্ত স্বর্গ ॥
এই সপ্ত স্বর্গ পাঠ যে করিল শেষ
রাজার দর্শন স্বর্গে করিল প্রবেশ ॥
কোরআনের সপ্ত স্বর্গ বটে তিনোধ্যায়
তেকারণে তিন পাঠ্যে পড়য়ে তাহায় ॥
মাতাপিতা সংমিলনে তনয় জন্মান
তেহি সে কারণে হৈল ত্রিলক্ষ ভুবন ॥
সেই তিন পাঠ্য হয়ে রাজার ত্রিপাঠ
গুণীগণে বলে যারে ত্রিবেণীর ঘাট ॥
যেই ঘাট স্নানে সদা বাড়ে পবিত্রতা
যথা অন্ধকারে নিত্য পায়ে প্রসন্নতা ॥
যেই ঘাটে স্নানে জ্ঞান দীপ্তি প্রজ্বলিত
যেই ঘাট স্নানে হয় জীবন স্থায়িত্ব ॥
যেই ঘাট স্নানে হয় সাধু সিদ্ধ অঙ্গ
যেই ঘাট স্নানে হয় মহারাজ রঙ্গ ॥
যেই ঘাট স্নানে হয়ে পাপে পূণ্যবান
যেই ঘাট স্নানে পায়ে স্বর্গের উদ্যান ॥
আপ্ত ছবি দর্পণের পাঠে ছেকান্দর ॥
দ্বারার সমস্ত রাজ্যে হৈল রাজেশ্বর
ছেকান্দরী আর্শি যার হইল উজ্জ্বল
দ্বারার রাজত্বোবস্থা হেরয়ে নির্ম্মল ॥
ভব বিদ্যালয়ে আপ্ত পাঠের ত্রিপাঠ
দ্বিপ্রকার প্রেমরীতে করে সদা পাঠ ॥
ভাগ্য রবি যে শিষ্যের উদে ললাটেতে
পড়য়ে প্রথম পাঠ্য নিম্ন প্রেমরীতে ॥
দ্বিতীয় তৃতীয় উচ্চ প্রেমরীতে পাঠ
পড়িয়ে সাজায়ে আপ্ত রাজত্বের পাট ॥
নিম্ন প্রেম কারে বলে এই ভবপ্রীতি
যে কারণে নরকেতে হয়ে নরগতি ॥
উচ্চ প্রেম বটে মহারাজ ভালবাসা
যে হেতুয়ে হবে স্বর্গ দরশন আশা ॥
নিম্ন প্রেমরীতে বুঝা শব্দ সমতুল
উচ্চ প্রেমরীত তার বটে অর্থ মূল
মক্‌বুল অজ্ঞানে বলে চল বিদ্যালয় ॥
দূকুল রাজত্ব বিদ্যা করিবেক জয়

ত্রিপদী

অহে মূঢ়মতি মন বৃথা যায়ে এ জীবন
নিদ্রা তাজি হও সচকিত
এইরূপে অবহেলা অস্ত গেলে আয়ু বেলা
মনস্তাপে হইবে রোদিত ॥
যত তব সঙ্গিগণ লাভ কৈরে জ্ঞানধন
গেল নিজ নিজ নিকেতন
রাজার সমীপে গিয়ে তাহার দর্শন পেয়ে
হৈল সুবে পুলকিত মন ॥
চল অজ্ঞাপিত মন সাধিতে সুজ্ঞান ধন
ভব বিদ্যালয়ের মাঝার
পড়ি সেথা আপ্ত পাঠ সাধি লই রাজ্য পাঠ
আপ্ত আর্শি করি পরিষ্কার ॥
প্রবেশি দিল্লীর দেশে চিন সিংহাসনে বৈসে
নিরক্ষী সে অরুণ বদন
আকর্ষি অরুণ গুণ ইক্ষুর প্রায় নিপুণ
জ্যোতির্ময় করিগ ভুবন ॥
অধিন মকবুলে বলে সুজ্ঞান সাধিত হৈলে
প্রাণপণ ভজ গুরুজন
গুরুজন পাদপায়ে যে মিশিল ধুলি প্রায়
দুই কুলে হইল সুজন ॥

নিম্ন প্রেমরীতে আপ্তপাঠের প্রথম পাঠ্য

শূন্যপুরে ছিল মম উৎপন্নের স্থান
রাজত্ব বিহীনে মহারাজ পূজ্যমান ॥
একাময় মাত্র মম না ছিল দোসর
পাত্র মিত্র না আছিল নহে সহচর ॥
না আছিল রূপ গুণ না আছিল নাম
সর্বদা বিশ্রাম ছিল না আছিল ঠাম ॥
দুঃখ সুখ না আছিল নহে জয় ক্ষয়
না আছিল কার আশা না আছিল ভয় ॥
ক্রমে ক্রমে বিশ্রামি বিশ্রামি ছয় দিনে
শুভ জ্ঞান লাভ জন্য এনু এই স্থানে ॥
প্রথমাপ রূপমদে হইয়ে উৎসব
ধারিনু আপন নাম প্রেমের আর্ণব ॥
দ্বিতীয় দিনেতে করি গুন নিরক্ষণ
রাখিনু আপন নাম গুণ মহাজন ॥
তৃতীয়েতে করি সেই গুণাদি বিচার
রাখিনু নিজের নাম মহা গুণধার ॥
চতুর্থে সে গুণ বলে হইয়ে জীবন
প্রকাশিনু স্বীয় নাম জীবন ভুবন ॥
পঞ্চমেতে ধারি আপে বিবিধ আকার
ভবের সাগর নাম করিনু প্রচার ॥
ষষ্ঠমেতে হই আপে সর্ব্বকার মোট
স্বীয় নাম প্রকাশিনু নর ছবির কোট ॥
হেরিতে আপন আপে হৈল মন খেদ
নিরক্ষিয়ে নিজ রূপে হৈয়াছি বিচ্ছেদ ॥
বিরহ বিষম জ্বালা আহা কি কঠিন
স্বাধীনতা হারাইয়া হৈয়াছি অধিন ॥
ছয় ছিদ্র বক্ষ যদি পাই বাঁশি পায়
তবে বুঝাইতে পারি বিরহ কি দায় ॥
আপন হারাই আপে হইনু উদাস
এ বিরহ রোগে কত কৈরাছে বিনাশ ॥

গীত

দহে দহে মন মোর বিচ্ছেদেরি তাড়না।
জলে শান্ত নহে কিন্তু বাড়ে দ্বিগুণ যাতনা ॥
জলে আর স্থলে জ্বলে শয়নে স্বপনেতে জ্বলে।
আহা কি বিষম জ্বালা কোনরূপে নিভে না ॥
দারুণ বিরহ দায়, চিত্তয়ে কি সহা যায়।
বিয়োগ রোগ ঔষধ কোথা বুঝি মিলে না ॥
মকবুল অধীনে বলে, ভাণ্ডারীর পদতলে।
প্রিয়া বিনে এ তাড়না কভু শান্ত হবে না ॥

পয়ার

ছয় দিনে ছয় লক্ষ অব্দ পন্থ আসি
হইনু আপন তত্ত্বে কায়াবন্ধী বাসী ॥
এক রঙ্গি ঘুছিয়া দুরঙ্গেতে প্রকাশ
হারাধন জন্য সদা মনেতে উদাস ॥
স্বীয় দেশ ত্যাজি কিসে এল যেই দেশে
কিরূপে যাইব আহা পুনঃ স্বীয় বাসে ॥
আপ্ত গুণ ধন যত হারাই সমস্ত
হইলেম কায়াবন্ধী শালে অতি ব্যস্ত ॥
কিন্তু ছিল মাত্র এক পবিত্রতা গুণ
মাত্র সেই এক গুণে ছিলেম নিপুণ ॥
সেই গুণে জ্যোতির্ময় হৃদয় আমার
তেকারণে বলে সবে প্রসন্নকুমার ॥
সেই প্রসন্নতা গুণে গিয়ে স্বর্গ স্থানে

করিলে মানস পবিত্রতা সিংহাসনে ॥
সর্বথা সেঠাই নিত্যানন্দে পুলকিত
কোনই প্রকারে কভু নাহিক চিন্তিত ॥
মনোরম স্থান ছিল সে মহান উদ্যান
কিন্তু মাত্র চিন্তা এই ছিলেম অজ্ঞান ॥
নিষেধীয় বৃক্ষ এক ছিল সেই স্থানে
জ্ঞান বৃক্ষ বলে তাহে সর্ব্ব গুণীগণে ॥
ভক্ষিতে তাহার ফল নিষেধ রাজার
পাপীষ্ঠ হইবে তাহে করিলে আহার ॥
রাজার নিষেধ ছিল বুঝি ছলযুক্ত
ভক্ষাইতে নারদকে করিলা নিযুক্ত ॥
আহার করাল যবে নারদ সন্ধানে
উদয় হইল হৃদে জ্ঞান সেইক্ষণে ॥
চিন্তয়ে জন্মিল তবে এমত সন্তাপ
নিষেধ না মানি কেন করিলেম পাপ ॥
মম প্রতি রাজ আজ্ঞা হইল তখন
ভব কারাবন্ধী শালে করিতে গমন ॥
অসত্য হইলা তুমি করিয়ে আহার
ভব স্কুল কারা ঘরে শিখ সদাচার ॥
আপ্তপাঠ পাঠ করি কর জ্ঞান লাভ
মহারাজ ভাবে সদা ত্যজিয়েক ভাব ॥
কালে কালে পাঠাইব সদায় শিক্ষক
কারাভব হেতে তারা মাত্রই রক্ষক ॥
শিক্ষকের বাক্য পালি লাভ শুভ জ্ঞান
ভব বন্ধীশালা হৈতে পেতে পরিত্রাণ ॥
পাইবেক যত ক্লেশ ভব বন্ধীশালে
দুঃখিত না হবে মনে তাতে কোন কালে ॥
গুরুর মারনে কভু না হবে দুঃখিত
গুরুয়ে মারিয়ে করে সতত জীবিত ॥
গুরুর গরল বটে সুধা সমতুল
গুরু হস্তে মরে যেই পায়ে দুই কুল ॥
ভব স্কুলে যত ইতি গুরুর কিঙ্কর
গুরু করে মারে যদি মারয়ে চাপড় ॥
গুরুর চপট বটে স্বর্ণকারী বুটি
গুরুর চপটে হয়ে স্বর্ণ মাটি ঘটি ॥
ভাল মন্দ যত ইতি কর্ম্ম ভবালয়
গুরুর কৃপা দৃষ্টি বটে এসব নিশ্চয় ॥
গুরু দয়া দৃষ্টে যেই হইবে দুঃখিত

অত্যন্ত অজ্ঞান বটে, সেই অন্ধচিৎ ॥
গুরুর আদেশে যেই সদা আনন্দিত
নিশ্চয় সে হয়ে রাজা দর্শন বিহিত ॥
তবে রাজা আজ্ঞা পেয়ে আসি এভুবনে
মায়াপাশে বন্ধী হৈনু কাঞ্চনপুর বনে ॥
অহে প্রভু দয়াময় কৃপার ভাণ্ডার
মকবুল অধীনে কৃপা কর একবার ॥
ভব বন্ধীশালা হৈতে করি কৃপা দান
শুভ জ্ঞান দিয়ে আমা কর পরিত্রাণ ॥
আমার দুঃখ অবশেষ পরাণের নাথ
কুক্ষণে আসিলেম এই দেশ ধুয়া ॥
ত্রিপদী
মম দুঃখ বুঝিবারে জর্জরিত পাব কারে
কোথা আছে এ হেন দুঃখিত।
ভয়ঙ্কর দুঃখ মোর শ্রবণে হয় জর্জর
দুনয়নে যমুনা ভাসিত ॥
স্বীয় দেশ আনন্দিত ধন রত্নে অতুলিত
আছিলেম অতি পূজ্যমান।
হারিয়ে আপন ধন বন্দী হৈয়ে এ ভুবন
হৈয়াছি এখন স্তব্ধ জ্ঞান ॥
বন্ধু মিত্র জন বিনে কাঞ্চনপুরের বনে
অতি ক্লেশে আছি বনবাসী।
দৈত্যগণ ভয়ানক তাতে হেরিনু অনেক
না দেখি কাহারে স্বীয় দেশি ॥
চৌদিকে কন্টক স্থানে দেখি নানা জন্তু বনে
হৃদয় কম্পয়ে থর থর।
অহে প্রভু কৃপাদানে এহেন সঙ্কট স্থানে
এ মকবুলে ত্বরাও সত্বর ॥
ছোনাআনী প্রসিদ্ধ গুরুর গল্প
ছোনাআন দেশে ছিল প্রসিদ্ধ সুজন
পবিত্র কাবার ঘরে তাহার আসন ॥
কাবার ঘরেতে ছিল পঞ্চাশ বৎসর
চারি শত সাধু শিষ্য তার সহচর ॥
মহাম্মদি ধর্মে ছিল অতি জ্ঞানবান
কেহ না আছিল তবে তাহার সমান ॥
সত্তা গুণে কি কহিব কেমন নিপুণ
সাধুত্যা গুণেতে কিছু না আছিল উন ॥
একদা স্বপ্নেতে দেখে সেই জ্ঞানবান

কাবা বাহিরে এক মনোরম স্থান ॥
সেই স্থানে কোন এক প্রতিমা গোচরে
ভক্তিরূপে প্রণিপাত করে নম্র শিরে ॥
স্বপ্ন দেখি নিদ্রা থাকি হৈয়ে জাগরিত
স্বপ্ন মর্ম বুঝি মনে হইল ভাবিত ॥
মম ধর্ম পন্থে বুঝি পড়িল সঙ্কট
না জানি কিরূপে হবে সুরক্ষা প্রকট ॥
সহজে ত্যজন যায় জীববনের ধন
হারিতে সঙ্কট অতি সুধর্ম রতন ॥
সকলের পন্থে আছে এমত সঙ্কট
সঙ্কট রক্ষাতে পন্থ হইবে প্রকট ॥
আটকিয়া থাকে যেই সে বিপদ স্থানে
ধুলি পড়ে যায় তার মুক্তির দর্পণে ॥
কতদিন পর সেই মহৎ সুজন
গমন করিল রুমে লিয়ে শিষ্যগণ ॥
পন্থে যেতে হেরি এক ইছাই কুমারী
মনপ্রাণে সাধে হৈল রূপের ভিখারী ॥
রূপরাশি চক্রে যেন অরুণ উদিত
হেরিতে যাহার জ্যোতি জ্ঞান অন্তহিত ॥
তাহার চিকুরে মন বান্ধে যেই জন
কত ধ্যানে হয়ে পৈতা কণ্ঠার ভূষণ ॥
কটাক্ষের শরে যারে হানয়ে হৃদয়
বংশী প্রায়ে তার বক্ষ হয়ে ছিদ্রময় ॥
অধরের সুধা আশে ভুবন তৃষিত
কিন্তু কটাক্ষের শরে সদায়ে ত্রাসিত ॥
ওষ্ঠ জীব জল কুপ প্রেমিক কারণ
ইছা নবি প্রায় তার সুরস কথন ॥
অরুণ বদনে ছিল কিরণ মুখস
নেত্র জ্যোতি হ্রাস ভয়ে হেরিতে কর্কশ ॥
হেরিতে নির্ম্মল রূপে লাগিল অনল
কন্যা প্রেম সিদ্ধ মনে হইল প্রবল ॥
দৃষ্টিপাত করিতে সে কুন্তলের পানে
অধর্ম্মতা মসী পৈল সুধর্ম্ম দর্পণে ॥
ধর্ম্ম ত্যাজি অধর্ম্মতা করিল গ্রহণ
জীবনে খেলিতে হৈল প্রেমের কারণ ॥
খিডকী আচ্ছন্নে হেরি অরুণ ঝলক
কুমুদের প্রায়ে হৈল অরুণ সেবক ॥
শয়ন ভোজন সব হইল রহিত

প্রিয়সীর রূপ ধ্যানে সদায়ে রোদিত ॥
মনেতে করিতে যবে সেইরূপ ধ্যান
হইত আপন হারা অন্তহিত জ্ঞান ॥
জ্ঞান বুদ্ধি যত ছিল হারিল সকল
মাত্র প্রিয়সার প্রেম হইল প্রবল ॥
মোহিনীর মুর্ত্তি হৃদে হৈল প্রকাশিত
কাবাকে ত্যজিয়া হৈল মন্দির বাসিত ॥
দিবস যামিনী যায়ে তার এইরূপ
রূপসীর রূপ ধ্যানে থাকে সদা চুপ ॥
প্রেমের বিষম জ্বালা দহি মনান্তর
প্রিয়সীর পন্থে গিয়ে বসিল সত্বর ॥
দরশন আসে সেই রূপের মুকুর
মনসাধে হৈল সেই গলির কুকুর ॥
সেই পন্থ ধুলা শয্যা রহে অনুদিন
পূর্ণিমার তনু তার হইল নবীন ॥
কতদিন গত হৈল যবে এই মত
তার মনস্তাপে কন্যা হৈল অগত ॥
একদিন সেই রূপবতী ছদ্মবেশে
উপস্থিত হৈল এসে ছোনাআনী পাশে ॥
বলে কোথা শুনিয়াছ তোমা হেন ঋষি
থাকিতে ইছাই পন্থে এইরূপে বসি ॥
যার কণ্ঠে পড়ে মম চিকুরের ফাঁদ
থাকিতে হইবে তার সর্ব্বদা উম্মাদ ॥
সিদ্ধ বলে তুমি আমা পাইয়ে সরল
মনপ্রাণ জ্ঞান বুদ্ধি লুটিছ সকল ॥
তোমায়ে ছাড়িয়ে কোথা যাইব এখন
নতুন ফিরি দেও মম হারা মন ধন ॥
ঠমক কৈরনা এত তুমি নানারঙ্গে
শীঘ্র এসে মম প্রাণ মিল দেহ সঙ্গে ॥
সহজে কি হইয়াছি এমত অস্থির
নতুন এসে মিল নতুন লও মম শির ॥
তোমার চিকুর ওষ্ট মম জয় ক্ষয়
তব কৃপা বিনে মম নাহিক আশ্রয় ॥
তব মুখ জ্যোতে হৃদে জ্বলয় অনল
দরশন আশে সদা নয়ন সজল ॥
ভাসিয়ে ভুলিয়ে জল অনল মাঝার
আশার আশায়ে কাল যেতেছে আমার ॥
তোমার নিমিত্তে ত্যাজি কুটম্ব স্বজন

মনস্তাপে পন্থে বৈসে করিনু রোদন ॥
প্রাণ পরিবর্তে প্রেম কৈরাছি কিনন
বিচারি দেখহ দেহে তুমি প্রাণধন ॥
মনপ্রাণ তব ভাবে সদায় খেদিত
বর্ষক মনের প্রায় নয়ন রোদিত ॥
নয়নেরি লক্ষে যাহা দেখিয়াছে মনে
কেহ দেখে নাই তাহা ত্রিলক্ষ ভুবনে ॥
যে অবধি মনে জন্মিয়াছে প্রেম ভাব
নেত্র রক্ত সিন্ধুধারে ভাসনই লাভ ॥
তব দ্বারে ধুল মূল্যে দিতে আছি প্রাণ
দরশন আশে মরি, কর কৃপা দান ॥
আর কত কাঁদিবাম দ্বারোনভ্যন্তরে
এবে খোলে দেও প্রাণ প্রিয়া আসি ঘরে ॥
রূপের অরুণ তুমি আমি রেণু প্রায়
তব জ্যোতি বিনে মম আছে কি উপায় ॥
আমি তব ছায়া প্রায় তুমি মম কায়া
তোমা ছেড়ে যাব কোথা না করিলে দয়া ॥
মম পক্ষ অধে হবে এ সপ্ত গগণ
যখন হইব প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ দর্শন ॥
ভুরু কাটারী আমাতে দিতেছি জীবন
সঙ্গে সঙ্গে থেকে কত রহিবে গোপন ॥
কন্যা বলে ছিছি একি বলিলা কথন
বৃদ্ধকালে কে কৈরাছে প্রেম আলাপন ॥
অন্তিম সময় তব অত্যন্ত অদূর
মরু মনে কি বিকশে প্রেমের অঙ্কুর ॥
সিদ্ধ বলে আর কিছু না করিয় ছল
নয়নেরি কূপে মম নাই আর জল ॥
প্রেমে বৃদ্ধ যুবা তুমি কি করিলে ভিন
প্রেম ভিন্ন না করয়ে যুবা পরাচিন ॥
কন্যা বলে হও যদি আমার প্রেমিক
প্রেম ধর্ম্মাচারে যদি হও তুমি ঠিক ॥
মম নেত্র বাক্য তুমি করহ পালন
তবে মম দর্শনাশা করিবে মনন ॥
আদ্যে প্রেম ধর্ম্ম নীতি মানি হেঁট শিরে
প্রণিপাত কর গিয়ে প্রতিমা গোচরে ॥
তারপরে জ্বালাইবে মহৎ কোরান
তবে মম প্রেমে হবে তোমার প্রমাণ ॥
সুরাপান করিবেক মানি প্রেমদেশ
নতুন নিজ পন্থ লও পরি নিজ বেশ ॥
এক রঙ্গে না মজিলে দুইজন মন
কদাচিৎ না হইবে প্রেমের সাধন ॥
দুই চিত্ত সংমিলনে প্রেমের সঞ্চয়
মনে মনে অমিলনে পিরিতি টুটয় ॥
সিদ্ধ বলে সুরাপান করিতে সম্মত
কিন্তু নারি করিবারে অই দু অসতঃ ॥
কন্যা বলে এস এস কর সুরাপান
সুরাপান করিলে সে হইব অজ্ঞান ॥
তবে শীঘ্রে ধৈরে করে অতি সমাদরে
কন্যায় আনিল তারে মন্দির মাঝারে ॥
আদ্যে কৈরাছিল সিদ্ধ প্রেম মদপান
সেই মদে আছিল সে অত্যন্ত অজ্ঞান ॥
প্রিয়সীর সঙ্গে হৈয়ে অতি আনন্দিত
মন্দির মাঝারে গিয়ে হৈল উপস্থিত ॥
প্রিয়সীর হস্ত থাকি মদ বাটি লিয়া
পান কৈল্য তাহে অতি হরষিদ হৈয়া ॥
হঠাৎ সে সুরাপান করিতেই মাত্র
একগুণ প্রেম তার হইল সহস্র ॥
উম্মাদের প্রায় হৈয়ে অতি স্তব্ধ জ্ঞান
আর এক সুরা পাটি করিল সে পান ॥
লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মগ্রন্থে আছিল পণ্ডিত
পানিতে সে সুরা বাটি হইল বিস্মৃত ॥
ধর্ম্মের সিদ্ধতা যত হইল হরণ
কন্যা প্রেম ধর্ম্মে হৈল এবে সিদ্ধ জন ॥
সিদ্ধ প্রেমে সিন্ধুপ্রায় হৈল তরঙ্গিত
তরঙ্গ চক্রেতে তব হৈয়ে নিমজ্জিত ॥
মনে হৈল তার আলিঙ্গন আকিঞ্চন
স্পর্শ করিতে কন্যা গর্জিয়া তখন ॥
বলিল হে প্রেমের অপক্ক একি কর্ম্ম
প্রবঞ্চক প্রেম তব নাই তাতে মর্ম্ম ॥
প্রেমধর্ম্ম বটে সর্ব্ব ধর্ম্ম আদি মূল
কোন ধর্ম্ম নহে ভবে প্রেম সমতুল ॥
প্রেমনীতি না মানিলে প্রিয়ার কারণ
সহজে কি প্রেম ধর্ম্ম হইবে সাধন ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাজি প্রেমধর্ম্ম কল্যে ঠিক
প্রেমিক নিকটে তবে হইবে প্রেমিক ॥
সর্ব্বধর্ম্ম যে না ত্যজে প্রেমের কারণ

প্রেম ধর্ম্মে নিশ্চয় সে কাপুরুষ জন ॥
দুঃখে সুখে জয়ে ক্ষয়ে যে হয়ে ভাবিত
প্রেম করা সেই জনে না হয়ে উচিত ॥
নরকের ভয় কিবা স্বর্গের ভরসা
কি রাখিবে হয়ে যেই প্রেমে আত্মনাশা ॥
প্রেম আর সুরাপানে সিদ্ধ হৈয়ে মত্ত
না লিল এ বাক্য শুনি কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব ॥
বলিতে লাগিল এবে যাহা আজ্ঞা হয়
সে আজ্ঞা পালিত মনে না করিব ভয় ॥
যদি করি নাই জ্ঞানে অই দুই কর্ম্ম
কোরান জ্বালাব আর ত্যজিব সুধর্ম্ম ॥
কন্যা বলে এবে তুমি মম উপযুক্ত
প্রেমিক সমাজে হবে শুদ্ধ প্রেম ভক্ত ॥
ইতি আদ্যে আছিলা অপক্ক প্রেম ধর্ম্মে
ধন্য তোমা একে হৈলা পক্ক প্রেম ধর্ম্মে ॥
সর্ব্বত্রে হইল চর্চ্চা সিদ্ধ মহাজন
স্বীয় ধর্ম্ম ত্যজি করে ইছাই গ্রহণ ॥
ইছাই আছিল যত আসিয়ে সত্বর
সমাজ সাজাল সবে মন্দির ভিতর ॥
পৈতা এক বান্ধিলেক সিদ্ধের কণ্ঠায়
ইছাইল হইল ধর্ম্ম ত্যাজি হায় হায় ॥
মুর্ত্তিকে প্রণতি করি কোরান তখন
জ্বালাই করিল ভস্ম প্রেমের কারণ ॥
তবে সিদ্ধ বলে যদি থাকে অবশিষ্ট
তাহাও করিব মনে না ভাবিব কষ্ট ॥
প্রণিপাত করিয়াছি করি সুরাপান
ভস্ম কালি করিয়াছি জ্বালাই কোরান ॥
পঞ্চাশ বছর সেবা কাবার মাঝার
করিয়াছি তোমার নিমিত্তে ছারখার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত ছিল কৈরাছি বিনাশ
মনে করি মাত্র তব দরশন আশ ॥
মকবুল অধীনে প্রেমে এই মত
কৈরাছে করিবে আর কত শত শত ॥
প্রেমের অপক্ক বটে জ্ঞানের বিখ্যাত
প্রেম শাস্ত্রে আদ্য পাঠ্যতাজে ধর্ম্মজাত ॥
এবেএসে মিল প্রাণকান্তা মম সঙ্গে
আমা আলিঙ্গন কর প্রেমের তরঙ্গে ॥
কন্যা বলে আমি ধনী তুমি হে দরিদ্র
অক্ষম হইবে দিতে আমা এক বস্ত্র ॥
ধনীয়ে ধনীয়ে মেলা কাঙ্গালে কাঙ্গাল
সমান না হৈলে প্রেমে ঘটয়ে জঞ্জাল ॥
কিছুমাত্র ভিক্ষা লিয়ে লও নিজ পন্থ
মম দরশনে কভু না হইবে শান্ত ॥
সিদ্ধ বলে হায় তুমি ভাল বাক্য পাল
সকল লুটিয়ে একি ঘটাও জঞ্জাল ॥
অদ্য হৈতে এ অবধি প্রেমে কোন জন
বলে নাই এরূপ বাক্য কদাচন ॥

রাগ তহি

হায় একি মোর, দুঃখ ঘোরতর, ঘটিল বিষম দায়
মনেরি সন্তাপে, প্রিয়সী সমীপে, কাঁদিনু চাতকী প্রায় ॥
কটাক্ষেরি শরে, হানিয়ে আমারে, লুটিছ মনেরি ধন
দি এত যাতনা, বিমুখ হৈয় না, যায় না প্রাণে সহন ॥
তোমার লাগিয়ে, স্বদেশ ত্যজিয়ে, কৈরাছি সকল ভিন
এসাছি এদেশে, অতি দুঃখ ক্লেশে, হই প্রেমের অধীন ॥
করি ধর্ম্ম নষ্ট, হৈয়ে কুল ভ্রষ্ট, ধৈরাছি তোমারি পাশ ॥
প্রাণেরি প্রিয়সী, সমাদরে তোষি, পুরাও মনেরি আশ ॥
নচেৎ এখন, ত্যজিব জীবন, পরাণে হইব শেষ
প্রেমের শোচনা, পাইয়ে যাতনা, প্রাণে সহেন বিশেষ
বলয়ে মকবুলে, প্রেমেতে পড়িয়ে, নাহিক জীবন আশ
প্রেমেরি আশায়ে, প্রথম যাত্রায়ে, হয়ে সম্পূর্ণ বিনাশ ॥

পয়ার

কন্যা মনান্তরে এসব বিনয়
বলিতে লাগিল তারে হইয়ে সদয় ॥
ধন অর্থ রত্নে যদি হইলে অক্ষম
অপারগ হও যদি করিতে সঙ্গম ॥
তবে বিনা আপত্তিয়ে তুমি এক সাল
চরাইতে ইচ্ছি লও সুকরের পাল ॥
এক অব্দ গত হই যাবে যেই ক্ষণ
মনস্কাম পুরিবেক পাইবে দর্শন ॥
প্রিয়সীর মুখে শুনি এমত কখন
সুকর চরাণ সিদ্ধ করিল গ্রহণ ॥
এই ভবে সুধু সিদ্ধ নহে একজন
এমত সুকর করে সকলে পালন ॥
সর্ব্বদা থাকয়ে হৃদ বাসায়ে লুকিত
পন্থেতে সঙ্গম সমে হয়ে প্রকাশিত ॥
যেই জনে মারে নাই ঘরের সুকর
না পাইবে সেই কভু দরশন বর ॥